রূপকথার পারস্য
সলিল লাহিড়ী

রূপকথার পারস্য

সলিল লাহিড়ী

পারমিতা পাবলিকেশন
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৫শে আষাঢ় ১৩৮৬ | জুলাই ১৯৭৯
আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে প্রকাশিত

প্রকাশক ঃ
রত্না ঘোষ
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক ঃ
মৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮/সি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ছবি ও প্রচ্ছদ ঃ অমিতাভ দত্ত

দাম ঃ দশ টাকা

Rupkathar Parasya :
A collection of Fairy Tales in Bengali based on Persian Folk stories by Salil Lahiri

রিন্কু-মম তাতাই বাবুকে

সূচীপত্র

ইস্পাহানের শাহ্‌···১
ইন্দারকার মোমবাতি দান···১৭
ফারুদিনের প্রতিশোধ·· ৩৩
তীরন্দাজ বাইজান · ৪৯

চিত্রসূচী

টেবিলের ওপর নানারকম খাবার···৪
কাঠের তলোয়ারটা আকাশের দিকে···১৪
বাঁ-হাতে মশাল নিয়ে আবছুল্লা এগুতে লাগল···২১
দরবেশটা মোমবাতির শিখা থেকে বেরিয়ে এসেই···২৮
কাঁধের ছ-জায়গা থেকে ছুটো সাপ হিস্‌হিস শব্দ করছে ··৩৮
বল্লমের মাথায় বসালো এক ষাড়ের মুণ্ডু··৪৬
বাইজান ঘোড়ার লাগাম ধরে টান মারল···৫৫
অন্তর-মন্তর-যন্তর যাছ্‌-পেয়ালা মন্তর···৬৩

লেখকের অন্যান্য বই

ছোটদের জন্য : সাগরপারের রূপকথা, কাশ্মীরের ঝঙ্কার
বড়দের জন্য : জলতরঙ্গ (উপন্যাস), আন্নাসায়ের হাসিকান্না (উপন্যাস)

ইস্পাহানের শাহ

ইস্পাহান শহরের শাহর রাজ্য সুবিশাল। রাজ্যের নানান চিন্তা-ভাবনায় ইস্পাহানের শাহর আজকাল রাত্রে ভাল করে ঘুমই হয় না। ফলে শাহর মন-মেজাজ দিনে দিনে খারাপ হয়ে যেতে লাগল। তাই দেখে একদিন উজীর বললেন, "মহান শাহ আপনার মাথায় রাজ্যের কত চিন্তাই না চাপান আছে। তার উপর এই অনিদ্রায় আপনি যে অচিরেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

"কি করি বলুন মহামান্য উজীর, রাতে বিছানায় শুলেও আমার ঘুম আসে না। কেবল রাজ্যের নানান চিন্তায়, শত্রু-মিত্রদের ভাবনায় চোখের দুটো পাতাও এক করতে পারি না। বলুন তো উজীর, এই অনিদ্রার হাত থেকে রেহাই পাই কি করে?"

উজীর বলল—"মহান শাহ, আপনি দিনরাত চিন্তা করেন বলেই তো চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। আপনি কেবলই ভাবছেন আপনার অনেক শত্রু। তাই কেবল আতংকিত হচ্ছেন। বরং এক কাজ করুন। গোপনে প্রজাদের মধ্যে আপনি ঘুরে বেড়ান। দেখুন

প্রজারা কি বলছে? তাহলেই বুঝবেন আপনার কে শত্রু, কে মিত্র? রাজ্যই বা কেমন চলছে তাও জানতে পারবেন। খবর সঠিক জানলে আপনার দুশ্চিন্তাও যাবে, রাত্রে ভাল ঘুমও আসবে।"

শাহ বললেন—"একথা মন্দ বলেন নি উজীর। আপনি খবর দিন নগরপালকে যে কাল থেকেই আমি প্রত্যেকদিন কিছুক্ষণ করে শহর ঘুরতে বার হব। আমার সংগে কিছু রক্ষী থাকবে।"

উজীর বলল—"সে কি হুজুর, এরকম ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রজাদের মধ্যে যদি ঘুরে বেড়ান কে আর আপনাকে আসল কথা বলবে। সবাইতো জেনেই যাবে আপনি শাহান-শাহ। তখন নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা কেউ কি আর প্রাণখুলে জানাবে। আপনি ছদ্মবেশে একলা শহর ঘুরলে তবেইতো সব সঠিক খবর পাবেন।"

"সে কি উজীর!"—চমকে উঠেন শাহ আলাল—"রাত্রে একলা ঘুরলে যদি শত্রুরা আমাকে আক্রমণ করে? কে তখন রক্ষা করবে?"

"শত্রুরা যদি সত্যিই এত নিষ্ঠুর হয়, তবে আজ না হয় কাল শত্রুর হাতে আপনার মৃত্যু হবেই। তার চেয়ে যাচাই করুন আপনার শত্রু আছে কিনা? —উজীর স্থির কণ্ঠে বলে।

"বাঃ শত্রুরা যদি মেরেই ফেলে তবে শত্রুদের মতামত আর জেনে লাভ কি?"—শাহ বিমর্ষ গলায় বলেন।

উজীর একটু হেসে বলে—"শাহান-শাহ, আপনিতো আমায় বিশ্বাস করেন। আপনার ক্ষতি কি আমি চাই? আপনি যাবেন দরবেশের ছদ্মবেশে। এই ছদ্মবেশে আমিও মাঝে মাঝে যাই। কৈ আমার তো কোন বিপদ হয় নি। দরবেশের ছদ্মবেশে শহর ঘুরতে গেলে আপনারও কোন বিপদ হবে না।"

উজীরের কথায় ইস্পাহানের শাহ আলালের মনে ভরসা হলো। তিনি জানেন, এই উজীর তার কত বিশ্বাসী। তাই উজীরের কথামত ঠিক পরেরদিন সন্ধ্যেবেলা মুসলমান সাধুর ছদ্মবেশে প্রাসাদের গুপ্তদরজা দিয়ে একলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। আর উজীর

পাহারা দিতে লাগলেন প্রাসাদের ভিতরে শাহ আলালের শোওয়ার ঘরটা, যাতে কেউ চট্ করে সেই ঘরে ঢুকতে না পারে। কেন না, তাহলে সবাই জেনে যাবে শাহ প্রাসাদে নেই।

শাহতো এদিকে দরবেশের ছদ্মবেশে রাস্তা দিয়ে চলেছেন। আশে-পাশের লোকজন তার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছেও না, সেলামও করছে না। শাহ সবকিছু দেখছেন আর চলেছেন। এতক্ষণ অদ্ভুত কিছু ঘটনা শাহের চোখে পড়েনি তাই তিনি কোথাও একমুহূর্ত দাঁড়ান নি। এইরকম চলতে চলতে শাহ এলেন শহরের শেষপ্রান্তে। হঠাৎ একঝলক মিষ্টি গানের আওয়াজ ভেসে এল শাহের কানে। তিনি ভারী খুশী হলেন। ভাবলেন—বাহ্, তার রাজ্যে তাহলে লোকেরা আনন্দেই আছে। এই কথাটা মনে আসতেই শাহ ভাবলেন যাই, দেখে আসি, এত দিল খুলে কে গান গায়।

শাহ গানের আওয়াজ লক্ষ্য করে এগুতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়লেন ভাঙা-চোরা দোতলা বাড়ির সামনে। সিঁড়ির দরজা খোলাই ছিল। তাই শাহ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

সিঁড়ি দিয়ে যত উপরে উঠছেন শাহ, ততই সুরেলা গানের রেশ কাছে আসতে লাগল। তারপর শাহ দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন। মিষ্টি গলার গান শুনে শাহ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। দরজায় ধাক্কা মারলেন,—ঠক্ ঠক্, ঠক্।

"কে?"—বাজখাঁই গলা ভেসে এল ভিতর থেকে। তারপরই খট্ করে দরজাটা খুলে গেল। শাহ তাকিয়ে দেখেন বিরাট দশাসই এক জোয়ান দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে।

লোকটা শাহর দিকে গোল গোল চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—"কে হে তুমি, এই রাত্রিরে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ করে আমাদের এই মিঠে গানের মজলিসটা নষ্ট করে দিলে? কি চাই তোমার?"

শাহ তো প্রথমে একটু ঘাবড়েই গেলেন। তাগড়াই লোকটা মার-ধোর করবে কিনা এই ভয় ছিল। লোকটা একটু ঠাণ্ডা হতে

টেবিলের ওপর নানারকম খাবার···

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—"দেখ বাপু, আমি সামান্য এক দরবেশ। রাত হয়ে গেছে, তাই একটু আশ্রয় চাচ্ছি।"

দশাসই লোকটা ছদ্মবেশী শাহকে চিনবে কি করে? সে বলল—"ঠিক আছে, তুমি যখন একজন দরবেশ, থাক ঘরের ঐ কোণটায়। তবে এক শর্তে তোমায় থাকতে দেব। রাত্রে খাওয়ার দাওয়ার চাইলেই ঘাড় ধরে বার করে দেব। আর গানের মাঝখানে একফোটা টঁ্যাফুঁ করবে না। তাহলেই সোজা রাস্তায়, বুঝেছ?"

ছদ্মবেশী শাহ বললেন—"আমি তাতেই রাজী। রাত্রে কোন খাওয়ারও চাইব না, কোন কথাও বলব না, এইতো?"

শাহ এসে বসলেন ঘরের কোণে, মেঝেতে, চুপটি করে। ঘরটায় ভাল করে তাকাতেই দেখেন টেবিলের ওপর নানারকম খাবার। মাংসের কাবাব, নানা রকমের ফল, পাত্র ভর্তি পানীয়, আরও কতকি! ফুলদানীতে সাজান ফুল। দেখলেই মনটা খুশী হয়ে যায়।

পালোয়ান লোকটা দরজা বন্ধ করে এসে খাওয়ার টেবিলে বসল। আবার খাওয়া শুরু করল। আর তখনই শুরু হল আবার গান। গানের স্বর ভেসে আসতেই ছদ্মবেশী শাহ ঘরের অন্য কোণে তাকালেন। তাকিয়ে দেখেন—আরে, সেখানে পাকাচুল ওয়ালা এক বুড়ো। সেই বুড়োর গলায় মিঠে গানের আওয়াজ।

অনেকক্ষণ গান চলল। তারপর একসময় গান শেষ হতেই সেই দশাসই লোকটা বুড়োর কাছে এল। পকেট থেকে বার করল একটা মোহর। তারপর বুড়ো গায়কের হাতে দিয়ে বলল—"বুড়ো মিঞা, আবার কাল এসো।" তারপর হাতধরে বুড়োকে দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল। বুড়ো গায়ক যাওয়ার আগে হাত তুলে আশীর্বাদ করল তাগড়াই পালোয়ানটাকে। বলল—"আল্লা, তোমার মঙ্গল করুন। শাহানশাহ তোমার ভাল করুন।"

বুড়োর কথা শুনে ছদ্মবেশী শাহ আলাল চমকে উঠলেন। ভাবলেন—আরে, লোকে তবে ভগবানের সংগে আমাকেও স্মরণ করে।

এদিকে বুড়ো চলে যেতেই দরজা বন্ধ করে পালোয়ানতো আবার খেতে বসল। আর ছদ্মবেশী শাহ চুপ করে তার খাওয়া দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ এক হুঙ্কারে চমকে উঠলেন ছদ্মবেশী শাহন। দেখে তাগড়াই পালোয়ান চেঁচিয়ে বলছে—"দেখ বাপু, তোমায় রাত্রে খাওয়ার চাইতে মানা করেছি বলে বুদ্ধুর মত না খেয়েই থাকবে নাকি? টেবিলে এসে কিছু খাওয়ার চাইলে কি তোমার জাত যেত? ঐরকম চুপচাপ বুদ্ধুর মত বসে থাকা আমার একদম পছন্দ নয়। এসো, উঠে এসো খাওয়ার টেবিলে।"
কোন কথা না বলে শাহ টেবিলে উঠে এলেন। তাগড়াই লোকটা মাংসের কাবাব উঠিয়ে দিল হাতে। ফল, পানীয় দিল খাওয়ার জন্য। শাহ খেতে শুরু করলেন একটাও কথা না বলে।
একটু পরেই আবার ভেসে এল হুঙ্কার।—"দেখ বাপু, এরকম গোমড়ামুখো, চুপচাপ লোক আমার দু চোখের বিষ। না হয় বলেছিলাম গানের সময় কথা বলবে না। তাই বলে খাওয়ার টেবিলে বোবার মত বসে থাকতে কে বলেছে হে? হয় কথা বলতে বলতে খাওয়া দাওয়া চালাও নয়তো হাতুড়ির এক ঘায়ে তোমার মাথাটা চৌচিড় করে দেব, বুঝেছ? দেখছ এই মাসেলটা, দিনে পাক্কা দশ ঘন্টা হাতুড়ি পেটাই, মনে থাকে জেনো। নাও বল, সত্যিকারের কে হে তুমি? দরবেশের বেশভূষা পড়লে কি হবে তোমাকে সাধুর মতো দেখতে লাগছে না।"
কোন কথা না বলে মুচকি হাসলেন দরবেশ-ছদ্মবেশী শাহ। তখন পানীয়ের পাত্রে একটু চুমুক মেরে পালোয়ান লোকটা বলল—"বেশ, আমিই না হয় আমার পরিচয়টা আগে দিচ্ছি। তারপর তোমারটা বোলো। আমি হচ্ছি এ শহরের নামকরা কামার বসিম। দিনে দশঘন্টা কামারশালায় হাতুড়ি পেটাই। যেই পাঁচটি মোহর হাতে এসে যায়, ব্যস্, কাজ বন্ধ করি। সন্ধ্যেবেলায় বাজার থেকে কিনি প্রথম মোহরে মাংসের কাবাব, দ্বিতীয় মোহরে নানান পানীয়, তৃতীয়

মোহরে ফল ও অন্যান্য খাবার, চতুর্থ মোহরে ফুল মোমবাতি ইত্যাদি। আর পঞ্চম মোহর খরচ করি স্রেফ গান শুনে।"

শাহ এই প্রথম মুখ খোলেন। বলেন—"তাহলে দিনে যা পাও, রাত্রে সব খরচা করে ফেল। তাহলে পরের দিন চলে কি করে?"

বসিম বলে—"কেন আবার কামারশালায় কাজ করে পাঁচ মোহর রোজগার করি। ব্যস্, চলে এইভাবেই। যারা আনন্দ করতে জানে না তাদের মত বোকা কে আছে বল?"

"ধর যদি এমন হয়, ইস্পাহানের শাহানশাহ এই কামারশালাগুলো বন্ধ করে দেয়, তখন চলবে কি করে? তখনও কি সন্ধ্যেবেলায় এরকম পাঁচ মোহর খরচা করে খাওয়া-দাওয়া, গানশোনা চলবে? রোজগারই যদি বন্ধ হয়, তখন আনন্দ করাও বন্ধ হয়ে যাবে।"

হেসে উঠে বসিম। বলে "দেখ বাপু, তোমার পাগলামী শুনতে মন্দ লাগছে না। তুমি কি ভাব আমাদের শাহানশাহর মাথায় গোলমাল আছে যে বলবেন কামারশালা বন্ধ করে দাও। আচ্ছা, ধরলাম যদি তাও হয়, দেখো, এই পাঁচ মোহরের নৈশ-ভোজ কিন্তু আমার বন্ধ হবে না। বেশতো, না হয় কাল এসো একবার, দেখবে। কালকেও ঠিক এরকম ভাবেই আনন্দ করে রাত্রি কাটাব আমি।"

ছদ্মবেশী শাহ বললেন—"বেশতো, না হয় কাল আসব।

হেসে উঠে বসিম। বলে—"দেখ বাপু, আমি আনন্দ করতে জানি। বুদ্ধি রাখি আর আল্লার ওপর ভরসাও রাখি। তাছাড়া শাহানশাহকে বিশ্বাস করি। তাই আমার কোন ভয়ই নেই।"—"বেশতো কালই না হয়ে ফয়সলা হবে। আজ বরং থাকছি না, চলি।" ছদ্মবেশী শাহানশাহ রাজপ্রাসাদে ফিরে আসেন। সমস্ত ঘটনা তখন মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজ্যের দুশ্চিন্তা কখন যেন পালিয়ে গেছে মাথা থেকে। তাই রাজপ্রাসাদে এসে ছদ্মবেশ ছেড়ে বিছানায় শুতেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়লেন শাহানশাহ।

সকালে উঠেই মনে পড়ল রাত্রের কথা। উজীরকে ডেকে পাঠালেন।

বললেন—"দেখুন রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিন, আজ থেকে সাতদিন এই রাজ্যের সমস্ত কামারশালা বন্ধ থাকবে। অন্যথায় প্রাণদণ্ড হবে।"

সকালে উঠেই শাহানশাহর এরকম আদেশ শুনেতো উজীর অবাক। শাহানশাহ মুচকি হেসে বললেন—"ভয় নেই মহামান্য উজীর, কাল সান্ধ্যভ্রমণের পর রাত্রে বড় ভাল ঘুম হয়েছে। আমার মাথার কোনও গোলমাল হয়নি। আদেশটা যেন আজ থেকেই চালু হয়।"

বেচারা উজীর আর কি করেন, শাহ আলালের কথামতই রাজ্যে সাতদিনের জন্য সব কামারশালায় তালা পড়ল।

এদিকে রাত্রের খাওয়া দাওয়ার পর যথারীতি সুখে নিদ্রা গেছে বসিম। প্রতি দিনের মত বেশ বেলা করেই ঘুম থেকে উঠে, চান করে এসেছে কামারশালায়। এসেই তার চক্ষুস্থির! একি ব্যাপার! তার কামারশালায় তালা? আশেপাশের লোকজনদের জিজ্ঞেস করতেই জানতে পারল শাহানশাহর আদেশটা। তাহলে এখন কি করবে বসিম? রাত্রের খাওয়া-দাওয়া গান-বাজনার জন্য যে পাঁচ মোহর দরকার, তার কি হবে?

বসিম কিন্তু এই ঘটনায় ঘাবড়াল না। মনে মনে ভাবল ভালই হয়েছে—হাতুড়ি পেটানো বড়ই কষ্টকর কাজ। দেখি অন্য কি কাজ করা যায়। ভাবল, যখন গায়ে জোড় আছে, মাথায় বুদ্ধিও আছে, তখন আর ভয় কি?

কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে বসিম দেখল কয়েকজন লোক টিনে করে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভাল করে খবর নিতেই বুঝতে পারল ঐ লোকগুলো জল বিক্রি করে টাকা রোজগার করে। বসিম মনে মনে বললো—বাহ, একাজ তো আমিও করতে পারি। এরপর দিনভোর জল বিক্রি করে বসিম পাঁচ মোহর সেদিনও রোজগার করে ফেলল। আর তারপর সন্ধ্যেবেলায় ঠিক অন্যদিনের মত নানান খাবার, ফুল কিনে এনে টেবিল সাজাল।

এদিকে রাত্রি হতেই শাহ আলাল ছদ্মবেশে এসে হাজির হলেন বসিমের বাড়ি। মনে উত্তেজনা—কামারশালাতো বন্ধ, দেখি বসিম টাকা রোজগার করতে পেরেছে কিনা! বসিমের ঘরে ঢুকেই শাহ আলালের চোখদুটো কপালে উঠে গেছে। কি আশ্চর্য! বসিম গতদিনের মতই পুরোদস্তুর আয়োজন করে রেখেছে। সেই বুড়ো গায়কও শুরু করেছে তার মিঠে গান।

ছদ্মবেশী শাহ আলাল গান শুনলেন। তারপর বসিমের সংগে খানা-পিনা শুরু হলো। কিন্তু মনের উত্তেজনা আর জিজ্ঞাসাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। শেষকালে জিজ্ঞেস করেই ফেলেলন "হ্যাঁ ভাই, শুনলাম শাহ আলাল নাকি কামারশালাগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন? তাহলে রোজগারপাতি হলো কি করে?"

কথা শুনেই বসিম রাগ করে উঠল। বললো—"দেখ বাপু, তোমায় খাওয়ায় নেমন্তন্ন করেছি, খাও-দাও আর কেটে পড়। তোমার সংগে অন্য কোন কথা বলছি না। তুমি নির্ঘাত যাদুকর। না হলে, কথায় কথায় যেই কালকে বললাম --যদি শাহ কামারশালা বন্ধও করে তাতেও আমি ভয় পাই না, আর ওমনি আজ সকালে শাহের মাথায় ভূত চাপল। কামারশালাগুলোও বন্ধ হলো এক সপ্তাহের জন্য। বুঝেছি, এসব তোমার যাদুর ফল। তুমি আসলে দরবেশ নও।"

শাহ আলাল হেসে বললে—"তুমি দেখছি খুবই চটেছ। আরে শাহের সংগে কি আমার আলাপ আছে যে তাকে যাদু করব। শাহ আলাল হয়ত বিশেষ কারণে ঐ আদেশ দিয়েছেন। যা হয়েছে তা স্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার। যাক্ ওসব কথা, বলত ভাই কামার-শালা বন্ধ, কিন্তু তবুও রোজগার বন্ধ হয় নি, ব্যাপারটা কি?"

"ব্যাপার আর কি? বলিনি তোমায়--মাথায় বুদ্ধি আর মনে স্ফূর্তি থাকলে সবকিছু করা যায়। রাত্রির খানাপিনা, আর গানবাজনার আনন্দ থেকে কোন কিছুই আমাকে বঞ্চিত করতে পারে না। দেখলে তো, আজও সমানে আনন্দে মশগুল আমি। কি করে জান? আজ

টিনে করে ঘরে ঘরে জল বিক্রি করলাম। ব্যস্, পাঁচটা সোনার মোহর হাতে এল। আর চাই কি ?”

“আচ্ছা, ধর যদি শাহ আলালের মাথায় আবার ভূত চাপে আর এই জল বিক্রি বন্ধ করে দেন, তখন কি হবে ?”

“দেখ, আবার বোকার মত কথা বলছ ? তুমি কি বলতে চাও আমাদের শাহ পাগল যে এরকম হুকুম করবেন। কিন্তু তবুও বলি, মাথায় বুদ্ধি আর মনে স্ফূর্তি থাকলে সবকিছু হয়। বেশ, কাল আবার এসো, দেখবে বসিম আজকের মতই স্ফূর্তি করছে।

“বেশ কাল সন্ধ্যেয় আবার আসব। খাওয়া দাওয়া হলো, এবার চলি বন্ধু।”—শাহ আলাল ফিরে এল রাজপ্রাসাদে সেরাত্রে। মাথায় চিন্তা—সত্যি কি জলবিক্রি বন্ধ করলেও বসিম টাকা রোজগার করতে পারবে ? চিন্তা করতে করতেই গাঢ় ঘুমে বিছানায় ঢলে পড়লেন শাহ আলাল।

তৃতীয়দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই শাহ ডেকে পাঠালেন উজীরকে। উজীর চিন্তান্বিতমুখে এসে হাজির। বললেন—“বলুন শাহ, কি হুকুম ?”

“দেখুন উজীর সাহেব আজকে এই মুহূর্তেই একটা হুকুমনামা জারী করুন। আজ থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত জল বিক্রি করা বেআইনী। যে এ নিয়ম না মানবে, তার গর্দান যাবে।”

উজীর কথা শুনে অবাক হয়ে তাকালেন শাহ আলালের দিকে। কিন্তু কি করবে, শাহর হুকুম, তাই তালিম করতেই হলো।

তৃতীয়দিন, সকালবেলায় বসিম যেই টিনে করে জল বিক্রি করতে যাচ্ছে, শাহর সেনা তাকে চেপে ধরল, বলল—“খবরদার, জলটল বেচা চলবে না। শাহ আলালের হুকুম।”

কথাটা শুনেই চমকে উঠল বসিম। কি আশ্চর্য, গতকাল রাত্রে জলবেচা বন্ধর কথা বলতেই আজ তাই করে বসল শাহ আলাল। মনে মনে বলল—বুঝেছি, এ সেই যাদুকর দরবেশের কাজ। আবার যাদু করেছে শাহকে। ঠিক আছে, জল বেচব না।

বসিম রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আর ভাবছে, আরে আমার মাথায় বুদ্ধি আছে, মনে ফূর্ত্তি আছে ঘাবড়াচ্ছি কেন। হঠাৎ মনে পড়ল, তাই-তো, আমার না জমকালো এক মনসবদারের পোষাক আছে। বাড়িতে যাই, সেটা পরে বেরুই, দেখি কি মজা হয়। এর পর যা-ভাবা, ঠিক তাই করল বসিম।

মনসবদারের পোষাক পরে হাঁটতে হাঁটতে বসিম এসে পৌঁছাল বাজারে। মনসবদারের পোষাক পরা বসিমকে দেখেই দোকানদাররা ভাবল শাহ আলালের লোক খাজনা নিতে এসেছে। তারা চটপট এসে টাকা-পয়সা দিতে লাগল বসিমকে। ব্যাপার দেখে বসিমতো অবাক। কিন্তু হাজার হলেও বসিমতো খুবই চালাক লোক। তাই চট করেই বুঝতে পারল দোকানদাররা কি ভুল করছে। তাই কিছু না বলে টাকা পয়সাগুলো পকেটস্থ করল বসিম। তারপর যেই না পাঁচ মোহরের মূল্য পেল তখন বাড়ি ফিরে এল। মনসবদারের পোষাক ছেড়ে পুরোনো পোষাক পরল আর পাঁচ মোহর মূল্যের খাবার-দাবার, পানীয়, মাংস ফুল ইত্যাদি কিনে বাড়ি ফিরল।

সন্ধ্যেবেলায় যথারীতি টেবিলে সেই খাবার-দাবার সাজিয়ে, ফুল-দানিতে ফুল রেখে বুড়ো গায়কের গান শুনতে বসল।

শাহ-আলালের এদিকে অস্থিরতায় সমস্ত দিন কেটেছে। ভাবছেন—আজ নিশ্চয়ই রোজগারপাতি বন্ধ বসিমের। ফলে আজকে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া-গান সবকিছুই বন্ধ থাকবে তার। তাই রাত হতেই শাহ-আলাল এসে হাজির হলেন বসিমের বাড়ি। কিন্তু ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলেন শাহ। একি, টেবিল ভর্তি খাবার, পানীয় ফুল। আর ঘরের কোণে বুড়ো গায়ক শুরু করেছে সেই মিঠে গান।

খেতে খেতে শাহ-আলাল সব শুনলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। খাওয়া শেষ হতে বললেন—"নাহ্, বুদ্ধি তোমার খুব খারাপ নয় হে। তবে দেখ, আল্লার মর্জি কি! হয়ত একদিন দেখবে সত্যিই পাঁচ-মোহর আর রোজগার করতে পারছ না। তখন কি করবে?"

শাহর কথা শুনে চটে উঠল বসিম। বলল —"দেখ বাপু, তুমি খুব সুবিধের লোক নও। দেখছি যেদিন মুখ দিয়ে যে কথা বার করছো, পরের দিন তাই ঘটে যাচ্ছে। তাই আর নয় খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো। এবার কেটে পড় বাপু। মেজাজটা বিগড়ে দিও না।"
শাহ আলাল কিছু না বলে মুচকি হাসলেন। তারপর যাওয়ার আগে বললেন—"আল্লা তোমার মঙ্গল করুন।"—তারপর ঘর ছেড়ে ফিরে এলেন রাজপ্রাসাদে। সে রাত্রেও বসিমের কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লেন শাহ আলাল।

পরের দিন সকালে উঠেই শাহ ডেকে পাঠালেন উজীরকে। উজীর ভাবতে ভাবতে এসে হাজির। আজ আবার কি উদ্ভট আদেশ জারী করবেন শাহ এই দুশ্চিন্তা তখন উজীরের মাথায়।

উজীরের শুকনো মুখ দেখে শাহ বললেন—"উজীর ভয় নেই। আজ নতুন হুকুম জারী করব না। আজ বরং দরবার বসলে, শহরের শেষপ্রান্তে বসিম বলে যে কামারথাকে তাকে ধরে নিয়ে আসবেন।"

উজীর বললেন—"সেকি হুজুর। বসিম তো খুব সাধাসিধে স্ফূর্তিবাজ লোক। হঠাৎ ওকে ধরে আনব কেন ?"

"আহা ওকে ধরে আনুনই না! তারপর সব জানতেই পারবেন।"—শাহর হুকুম। উজীর আর কি করেন। বসিমকে সকালবেলায় ধরে আনলেন রাজদরবারে।

হঠাৎ এরকমভাবে ধরে নিয়ে আসাতে বসিম তো অবাক। কিন্তু ঘাবড়ালো না তবুও। কারণ সে জানে তার মাথায় আছে বুদ্ধি, আর মনে স্ফূর্তি। তাই খোসমেজাজেই সে এল রাজদরবারে।

এদিকে শাহ-আলাল তখন তো আর ছদ্মবেশে নেই। পুরোপুরি শাহ-র পোষাক পরেছেন। মাথায় হীরের টুপি, গলায় মুক্তোর মালা, সে এক রাজসিক ব্যাপার। বেচারা বসিম শাহকে তাই চিনতে পারল না। পাকা দাড়িওয়ালা বুড়ো দরবেশের বদলে জোয়ান চেহারার, মসৃণ মুখের শাহকে সত্যিই তখন চেনা মুস্কিল।

বসিম এসে শাহ-আলালকে কুর্নিশ করল। শাহ গম্ভীর মুখে বললেন—"ওহে, শুনলাম তুমি নাকি আমার লোক সেজে কাল বাজার থেকে টাকা আদায় করেছো ?"

কথা শুনেই চোখ গোলগোল হয়ে গেল বসিমের ! মনে মনে বলল—বুঝেছি, এসব ঐ ভণ্ড দরবেশটার কাজ। ঠিক নালিশ করেছে শাহকে। কিন্তু বসিম তবুও ঘাবড়াল না। সে বলল—"কি করব হুজুর, আমি স্রেফ মনসবদারী পোষাক পরে দাঁড়াতেই সবাই ঝুপঝাপ এসে আমাকে টাকা দিয়ে গেল। আমিতো কারুর কাছে টাকা চাই নি। তবে টাকাটা আসলো যখন, নিতে আপত্তিও করি নি।"

শাহ বললেন—"বেশ, আজ থেকে তুমি সত্যিকারের মনসবদার হলে। তোমার কাজ হলো ঐ বাজার থেকে টাকা আদায় করা। আজ থেকেই কাজে লাগবে তুমি। একমাসে পাবে দুশো মোহর। বুঝলে।"—এই বলে শাহ আলাল এক তলোয়ার দিলেন বসিমকে। বললেন—"এই তলোয়ার তোমার এই পদমর্যাদার চিহ্ন। নাও, এটা খাপে ঢুকিয়ে কোমরে বেঁধে রাখ।" বসিম তলোয়ার আর মনসবদারের পোষাক নিয়ে বেরিয়ে এল।

শাহ ভাবলেন—দেখি এবার বাছাধন রাত্রে পাঁচ মোহর করে রোজগার কর কি করে? একমাসের আগে তো আর মাইনে পাচ্ছ না।

ওদিকে বসিমও ভাবছে তাই তো, মহা ফ্যাসাদ হলো। শাহর আদেশ মানতেই হবে। এই মনসবদারের কাজ না করে উপায় নেই। কিন্তু তাহলে আজ রাতের পাচ-মোহরের সান্ধ্য ভোজ আর গান যে বন্ধ হয়ে যাবে। চিন্তা করতে করতে হঠাৎ বসিমের বুদ্ধি এসে গেল মাথায়। তাইতো, এই ঝকঝকে তলোয়ারটা শুধু খাপের মধ্যেই তো থাকছে। আমি তো আর কারুর সংগে লড়াই করছি না, তাই স্রেফ খাপটা থাকলেও চলে। তবে শাহ তলোয়ার না দেখলে ক্ষেপে যাবে। তাই ইস্পাতের তলোয়ারটার মত দেখতে একটা কাঠের

কাঠের তলোয়ারটা আকাশের দিকে···

তলোয়ার তৈরী করে খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর ইস্পাতের তলোয়ারটা বেচে দিল পাঁচ মোহরে। সন্ধেবেলায় তাই যথারীতি আনন্দ করে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেলতে পারল।

শাহ আলাল কিন্তু পুরো নজর রেখেছেন বসিমের ওপর। যেই বসিম ইস্পাতের তলোয়ারটা বেচে দিল শাহ ঠিক করলেন এইবার বসিমকে পুরো জব্দ করা যাবে। সে রাত্রে বসিমকে কিচ্ছু বললেন না।

পরের দিন রাজসভা বসেছে। উজীর বসেছেন রাজার পাশে। সামনে মনসবদারী পোষাকে দাঁড়িয়ে আছে বসিম। কোমরে ঝুলছে সত্যিকারের খাপের মধ্যে কাঠের নকল তলোয়ার। শাহ একঝলক বসিমের কোমরের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন—"মহামান্য উজীর, নিয়ে আসুন তো ঐ অপরাধীকে।"

সবাই তাকিয়ে দেখে রাজ-সভার এককোণে হাত-পা বাঁধা একজন লোক। উজীর তাকালেন শাহর দিকে। তার চোখে বিস্ময়—যেন জিজ্ঞাসা করছেন শাহ আলালকে এ কে?

শাহ বললেন—"এই লোকটা এক অতি ধড়িবাজ চোর। বহুদিন ধরে চুরি করছে শহরে। তাই একে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। নাও মনসবদার বসিম, তোমার তলোয়ার দিয়ে এর মুণ্ডটা কেটে ফেল।"

শাহ আলাল মনে মনে হাসছেন আর ভাবছেন—এইবার বসিম, তোমার সব জারিজুরি ধরা পড়ল। বসিমও দেখল এতো মহাবিপদ। কিন্তু ঐযে সে জানে তার বুদ্ধি আছে আর মনে আছে স্ফূর্তি, তাই সে ঘাবড়ালো না। কোমর থেকে চট করে কাঠের তলোয়ারটা বার করে আকাশের দিকে উঁচু করে ওঠাল।

কাঠের তলোয়ার। তাই চিনতে আর কারুর বাকি থাকল না। শাহ-উজীর-সভাসদগণ হো হো করে হেসে উঠলেন। শাহ আলাল বললেন—"একি মনসবদার, তোমার ঐ ঝকঝকে ইস্পাতের তলোয়ারটা কাঠের হয়ে গেল কি করে?"

বসিম একফোঁটাও না ঘাবড়ে বলল "দেখুন হুজুর, সবই আল্লার

মর্জি। আল্লার মতে বোধ হয় এই লোকটা সত্যিকারের অপরাধী নয়। তাই একে বাঁচাবার জন্য আল্লা ইস্পাতের তলোয়ারকে কাঠের তলোয়ার বানিয়ে দিয়েছেন।"

বসিমের কথা শুনে শাহ-আলাল হো-হো করে হেসে উঠলেন। সিংহাসন থেকে নেমে এসে জড়িয়ে ধরলেন বাসমকে। বললেন—"সত্যিই তুমি বুদ্ধিমান বসিম। আমিই সেই দরবেশ বন্ধু তোমার। আজ থেকে তুমি এই রাজপ্রাসাদেই থাকবে আমার বন্ধু হয়ে।"

বসিম হেসে বলল—"তাই তো, এবার বুঝেছি শাহ-আলাল সব খবর পেতেন কি করে। দেখ দেখিনি কি আহম্মক আমি! তা শাহ আলাল, বন্ধু হতে রাজী আছি, কিন্তু প্রত্যেকদিন ঐ পাঁচ মোহর চাই যে। না হলে সান্ধ্য ভোজ আর মিঠে গান শুনব কি করে?"

শাহ-আলাল হাসলেন আর বললেন—"বেশ বেশ, তাই হবে। আজ থেক বন্ধু তোমার মাইনে হলো দিনে পাঁচ-মোহর। আর সে টাকা প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলায় পাবে। খুশী তো?"

বসিম বলল—"হ্যাঁ। এবার খুশী। কি বলিনি শাহ, মনে স্ফূর্তি আর মাথায় বুদ্ধি থাকলে সব হয়।"

ইঙ্গারাক্কার মোমবাতিদান

পারস্য দেশের পাহাড়-নদীর শেষে ছিল এক ছোট্ট গ্রাম। সেখানে ভাঙ্গা-চোড়া কুঁড়ে ঘরের মধ্যে থাকত এক বুড়ী আর তার একমাত্র ছেলে আবদুল্লা। ভালমানুষ বুড়ী কোনও রকমে কষ্টেসৃষ্টে দিন চালাত। আর তার সতেরো বছরের ছেলে আবদুল্লা জংগল থেকে কাঠ কেটে আনত, গরু চরাত, মার কাছে কাছে থেকে মাকে সাহায্য করত। টাকা—পয়সার কষ্ট থাকলে হবে কি, বুড়ী আর তার ছেলে আবদুল্লার মনে কোন অশান্তি ছিল না। বুড়ী ছেলেকে বলত—আল্লার উপর ভরসা রাখ। আল্লা ঠিক মঙ্গল করবে।"

মা-বেটার দিন এমনি করেই কাটে। এমনি সময়ে একদিন এক বুড়ো ফকির এসে উপস্থিত হলো। বুড়ীকে বলল—"বুড়ীমা, আমি বড় অসুস্থ। আমায় দিন কয়েকের জন্য একটু আশ্রয় দেবে ?"

বুড়ী তাড়াতাড়ি বাইরে এল। অসুস্থ বুড়ো ফকিরকে হাত ধরে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। ছেলে আবদুল্লাকে বলল—"দুল্লা, এই বুড়ো বাপজানের উপর একটু খেয়াল রাখ্। আমি বাইরে বেরুচ্ছি।

দেখি, কিছু খাবার-দাবার জোগাড় করতে পারি কিনা।"
আগন্তুক 'বুড়ো ফকির' বলল—"হ্যাগো, এত রাতে বাইরে যাওয়ার দরকার কি? ঘরে যা আছে তাই না হয় খেতে দিও আমায়।"
আবহুল্লার বুড়ী মা বলল—"বাপজান, আমরা বড় গরীব। আমাদের ঘরে যে আজ কিছু নেই। বাইরে না গেলে তোমার জন্য খাবার জোগাড় করব কি করে?"
মার কথা শুনে আবহুল্লা বলল—"আম্মীজান তুমি ঘরে থাক। আমি বাইরে যাচ্ছি।"—এই বলে আবহুল্লা বাইরে গেল খাবার জোগাড় করার জন্য। কিছুক্ষণ পর কিছু ফলমূল জোগাড় করে ফিরেও এল। বুড়ো ফকিরকে যতটা পারে আদর যত্নে রাখল আবহুল্লা আর তার বুড়ীমা। সপ্তাহখানেক থাকার পর বুড়ো ফকির সেরে উঠল। বুড়ী আর তার ছেলে আবহুল্লাকে বারবার আশীর্ব্বাদ করল, বলল—"আল্লা তোদের মংগল করবেন।"
বুড়ী বলল—"ফকির সাহেব, তুমি আমার এই ছেলে আবহুল্লাকে আশীর্ব্বাদ কর ও যেন সুখে থাকে। আমার দিনতো শেষ হয়ে এল। কিন্তু আমার একমাত্র চিন্তা ছেলেটার জন্য। আমি চোখ-বুজলে ওর কি হবে? কে ওকে দেখবে?"
ফকির বলল—"হ্যাগো মেয়ে, তোমার চিন্তা শুধু এই ছেলের জন্য, এই তো? বেশ, তোমার ছেলেটাকে যদি আমি নিয়ে যাই আমার সঙ্গে, তাহলে তোমার আপত্তি আছে? ভেব না, আবহুল্লার খাওয়া পড়ার কোন চিন্তাই তোমাকে করতে হবে না।"
—"এতো খুব আনন্দের কথা ফকির সাহেব। তোমার সঙ্গে থাকলে আবহুল্লার ভালই হবে। আমিও নিশ্চিন্তে হুবেলা আল্লার নাম করে বুড়ো বয়েসটা পার করে দিতে পারব।"
বুড়ো ফকির বলল—"দেখ বাপু তোমরা আমায় খুব আদর-যত্ন করেছ। তাই দেখি তোমার ছেলে আবহুল্লার জন্য কতটা কি করতে পারি। আমি এখন আবহুল্লাকে নিয়ে চললাম আমার সংগে।"—এই

বলে আবদুল্লাকে নিয়ে বুড়ো ফকির সেই গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। বুড়ী ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকল ছেলের দিকে। আবদুল্লা বলল—"ভেবোনা আম্মীজান, দেখ, আমি আবার ফিরে আসব।" ফকির বলল—"ঘাবড়িও না বেটি। তোমার ছেলে যতদিন সাচ্চা থাকবে, দয়ালু থাকবে, ততদিন কোন বিপদ তাকে ছুঁতে পারবে না।"—ফকির আর আবদুল্লা গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে এল। বুড়ো চলেছে রাস্তা দিয়ে। তার পিছনে পিছনে চলেছে সতের বছরের ছেলে আবদুল্লা। বুড়ো কিন্তু আসলে একজন শক্তিধর ফকির। কত রকমের যে তার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে সে খবর তো আবদুল্লা বা তার মা জানে না। তাই আবদুল্লা ভাবছে—এই বুড়ো কতক্ষণ আর চলতে পারবে আমার সঙ্গে ?

কিন্তু বুড়ো ফকির টুক-টুক করে চলতেই থাকল। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয়, আবার চলে। এমনি করে পার হল সাত-সমুদ্র, তের নদী। কেটে গেল সময়,—একমাস, দু-মাস, তিন-মাস। চলতে চলতে আবদুল্লার পা ব্যথা হয়ে গেল। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে আসতে লাগল। তাই-দেখে সেই বুড়ো-ফকির ইলবন্ বলল—"হ্যাগো আবদুল্লা, এইটুকু বয়েস, আমার চেয়ে কত্তো জোয়ান তুমি, এটুকু পথ আসতেই হাঁপিয়ে গেলে ? দেখ তো, এখনও কতটা পথ যেতে পারি। চল বেটা।"

বুড়ো ইলবন-এর কথা শুনে আবদুল্লার খুব লজ্জা হোল। ভাবল-তাইত, বুড়ো চলতে পারছে, আর আমি পারব না।—এই ভেবে, আবদুল্লা আবার আস্তে আস্তে চলতে সুরু করল।

এইবার কয়েকঘণ্টা চলার পর তারা এসে পৌছাল ধূ-ধূ মাঠের মাঝখানে। রুক্ষ মাটি, এবড়ো-থেবড়ো তার চেহারা। মাঠের মধ্যে কোনও গাছ-পাতার চেহারা পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। বুড়ো ইলবন কিন্তু এখানেও থামল না। আবদুল্লাকে নিয়ে চলতেই থাকল।

চলতে চলতে ক্রমে সূর্য্য ডোবার সময় হয়ে এল। আকাশ জুড়ে

তখন অন্ধকারের ছায়া। ঠিক সেই সময় ইলবিন্ এসে দাঁড়াল এক পাহাড়ের সামনে। পাহাড়টা বেঁকে ঠিক ধনুকের ছিলার মত সামনে দাঁড়িয়ে। উচু-নীচু কত চূড়ো সেই পাহাড়ের। আবদুল্লা বলল—"এখন কি করব ফকির সাহেব? চলার রাস্তা যে বন্ধ?"
ইলবন্ মিষ্টি করে হেসে তাকাল আবদুল্লার দিকে। বলল—"এখানেই তো আমরা থামব। শোন্ বেটা, এইবার আমি মন্ত্রের জোরে সামনের পাথরের দেওয়ালে একটা ছোট্ট পথ তৈরী করে দেব। কিন্তু সেই পথটা এত্তো ছোট্ট হবে যে শুধু তোর মত ছিপ্ছিপে একটা ছেলেই সেই পথে ঢুকতে পারবে। তুই সেই পথ দিয়ে ভিতরে ঢুকবি, বুঝলি?"
এই বলে বুড়ো ফকির—সেই মাথা উচু করা পাহাড়ের সামনে উচু হয়ে বসল। পিঠের ঝোলা নামিয়ে তার থেকে নানান গাছ-গাছড়া বার করল। বার করল একটা মশাল। পাথর ঠুকে মশালে আগুন জ্বালাল। মশাল দিয়ে গাছ-গাছড়ায় স্তূপটায় আগুন ধরাল। ধোঁয়ায়, ধোঁয়ার পাহাড়ের দেওয়াল আবছা হয়ে গেল। বাচ্চা ছেলে আবদুল্লা অবাক হোয়ে ফকির ইলবিনের ব্যাপার-স্যাপার দেখছে। ইলবন্ তখন সেই আগুনের সামনে বসে বিড়-বিড় করে মন্ত্র আওড়াচ্ছে—

"ইঙ্গারাক্কা কো—কো, পাথর বনে ফু-কো—
ঝন্—ঝনাঝন—ঝন্ঝন্, রাস্তা খুলে—ইলবন্।
খুলো পাথর খুলো—ইঙ্গারাক্কা কো-কো।"

মন্ত্র শেষ হতেই সেই বিশাল পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে শব্দ হোল—ঘড়, ঘড়, ঘড়। আর কি আশ্চর্য্য—পাহাড়ের মধ্যিখানে সরু একচিলতে রাস্তা দেখা গেল। ফকীর ইলবনের এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখে বাচ্চা আবদুল্লার চক্ষু চড়ক্গাছ।
ফকির ইলবিন্ তাকাল আবদুল্লার দিকে। বলল—"বেটা। এই রাস্তা দিয়ে সুড়ঙ্গের ভিতরে চলে যা। দেখবি সুড়ঙ্গ ধীরে ধীরে

বাঁ হাতে মশাল নিয়ে আবদুল্লা এগুতে লাগল

অনেক নীচে, পাতালের দিকে তোকে নিয়ে যাবে। সুড়ঙ্গের শেষে পাবি এক বিরাট গুহা। গুহার মধ্যে ঢোকবার পর যত কিছু দামী জিনিষ দেখবি, তার একটাকেও নিস্ না কিন্তু। গুহার একদম শেষদিকে দেখতে পাবি লোহার তৈরী খুব সাধারণ একটা বাতিদান। বাতিদানে বারোটা মোমবাতি জ্বালাবার বারোটা পিলসুজ আছে।"
আবদুল্লা বলেল—"তা আমাকে কি করতে হবে ?"
ফকির ইলবন্ বলল—"তুই সেই বারোটা পিলসুজওয়ালা লোহার বাতিদানটা আমায় এনে দিবি।"—এই বলে পাহাড়ের মধ্যিখানে যে খুব সরু ফাঁক তৈরী হয়েছে তার মধ্য দিয়ে আবদুল্লাকে ভিতরে পাঠাল। যাওয়ার সময় আবদুল্লার হাতে দিল জ্বলন্ত মশালটা। আবদুল্লা বাঁ-হাতে মশাল আর ডান হাত দিয়ে পাহাড়ের সরু দেওয়ালটা ধরে এগুতে লাগল। চলতে, চলতে, শেষকালে এসে দাড়াল এক বিরাট পাথরের দরজাওয়ালা গুহার সামনে।
দরজার ভারা পাল্লাটায় ডানহাত দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিতেই—কিং কিং, কিং—শব্দ করে পাথরের দরজাটা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মশাল হাতে আবদুল্লাও গুহাটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।
গুহায় ঢুকেই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আবদুল্লা। বিবাট ঘরের দেওয়াল জুড়ে কি অপরূপ কারুকার্য্য। মনে হচ্ছে যেন এক স্বপ্নের পুরী। পাথরের দেওয়ালে খোদাই করা কতরকম সুন্দর সুন্দর মুর্ত্তি। আর সেই মূর্ত্তিগুলোর গায়ে দামী মণি-মানিক্যের অলঙ্কার। চোখের তারায় জ্বলজ্বল করছে রুবী।
মেঝের দিকে চোখ পড়তেই দেখে দামী কার্পেট বিরাট মেঝেটায় বিছানো। একশ জন লোকও বোধ হয় সেই বিরাট কাটের্পটাকে বয়ে নিতে পারবে না এত্তো বড় সে কার্পেট।
এসব দেখে ছোট ছেলে আবদুল্লার চক্ষু চড়ক্‌গাছ। একবার ভাবছে, নিই না পাথরের মূর্ত্তিগুলো থেকে অলঙ্কারগুলে খুলে। তারপরেই মনে পড়ছে ফকিরের কথা, যতকিছু দামী জিনিষ দেখবি একটাও

নিস্ না কিন্তু। স্রেফ নিবি লোহার বাতিদান, ব্যাস্।
কি আর করে আবদুল্লা, লোভ সামলিয়ে এগুতে থাকল। এবার পৌঁছাল আর একটা বিরাট গুহায়। আবছা অন্ধকারে দেখে ঘরের মধ্যিখানে একটা বিরাট ড্রাগনের মূর্ত্তি হাঁ-করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই তো আবদুল্লা ভয়ে থমকে গেছে।
কিছুক্ষণ পর আবদুল্লা বুঝতে পারে ওটা সত্যিকারের ড্রাগন নয়। তখন আস্তে আস্তে ড্রাগনটার কাছে গেল। ড্রাগনটার হাঁ-করা মুখের মধ্যে তাকাতেই—চমকে উঠে! আরে এ যে মোহর আর সোনায় ড্রাগনের পেটটা ভর্ত্তি!
বেচারা আবদুল্লা, এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না। চট্ করে ড্রাগনের মুখের মধ্যে ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে একমুঠো মোহর তুলে নিয়ে জোব্বার পকেটে ঢুকিয়ে দিল।
আবদুল্লা এবার দু-নম্বর গুহা ছেড়ে তিন-নম্বর গুহার মধ্যে ঢুকল। মশালের আলো তখন প্রায় নিভু-নিভু। সেই আবছা আলোয় আবদুল্লা তিন-নম্বর গুহার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে হোচট খেল স্তূপাকার পড়ে থাকা কতকগুলো জিনিষের উপর। গা-হাত-পা ঝেড়ে উঠে বসে আবদুল্লা তাকাল স্তূপাকার জিনিষগুলোর দিকে।
আর তারপরেই চক্ষু ছানাবড়া। ওরে বাস্, ওগুলো কি চক্ চক্ করছে! কাঁচের মত ঝকঝকে, অন্ধকারেই জ্বলজ্বল করছে। হাতে তুলে নিল একমুঠো সেই জ্বলজ্বলে সাদা পাথর। ভাল করে তাকাতেই আবদুল্লার দু-চোখ রসোগোল্লার মত গোল গোল হয়ে গেল। এগুলো তবে কি হীরে! এতো হীরে।
এসব দেখে বেচারা আবদুল্লা আর কি করে লোভ সামলায়? তার জামায় যত পকেট ছিল তাতে ভর্ত্তি করল হীরে। হীরের ওজনে তখন আবদুল্লার পিট কুঁজো হয়ে গেছে। আর ঠিক সেই সময়েই নিভে আসা মশালটা দপ্ করে শেষবারের মত জ্বলে উঠে নিভে গেল। থমথম একরাশ অন্ধকার গুহার মধ্যে নেমে এল।

মশালের আলো নিভে যেতেই আবহুল্লার হুঁশ হোল। তাইতো অন্ধকারে কি করবে এখন সে? হাতড়ে হাতড়ে এদিক ওদিক যেদিকেই যায় বেরুবার পথ আর পায় না। এমনি সময় অন্ধকারে হোঁচট্ খেল আবহুল্লা। উঠতে গিয়ে কিসে যেন হাত পড়ল।
অন্ধকারের মধ্যে জিনিষটা হাত বোলাতেই দেখে—আরে, এটা যে সেই বারোটা পিলসুজওয়ালা লোহার মোমবাতিদানটা। এতক্ষণে মোমবাতিদানটার কথা তার মনে পড়ল। তাইতো বুড়ো ফকির শুধু এটাই নিয়ে ফিরতে বলেছিল। কিন্তু তার জোব্বার পকেটে এত হীরে মোহর, তাই বলে সেগুলো ফেলে যাবে?
আবহুল্লা মনে মনে বলল—হ্যুৎ তাও কখনও হয়? আল্লা এতগুলো দামী জিনিষ পাইয়ে দিল, আর ফকিরের কথায় সেগুলোকে ফেলে যাব? কক্ষনো না। বাতিদানটা দিয়ে দিলেইতো হোল।
এইসব ভেবে অন্ধকারের মধ্যে, আবহুল্লা এদিক ওদিক, চারদিকে খুঁজতে লাগল বেরুবার পথ। কতক্ষণ যে ঐরকম ঘোরাঘুরি করেছে তার হিসেব নেই। ঘুরতে, ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আবহুল্লা। হবেই বা না কেন? ভারী মোহর আর অতোগুলো হীরের পাথর বয়ে বেড়ানোতো আর চাট্টিখানি কথা নয়। তার উপর রয়েছে বাঁ-হাতে সেই ভারী লোহার মোমবাতিদানটা।
গুহার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্তিতে, ক্ষিদে তেষ্টায়, আবহুল্লার চোখে জল এসে গেছে। এক একবার তার মনে হচ্ছে আজীবন বুঝি গুহার মধ্যে বন্দীই থাকতে হবে। বেরুবার কোনও উপায় না দেখতে পেয়ে আবহুল্লা হাঁটু গেড়ে বসে, হু-হাত উপরে তুলে, চোখ বন্ধ করে আল্লাকে ডাকতে লাগল। —আল্লা, বার হবার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও। বুড়ো ফকিরের কথা না শুনে, হীরে মোহর নিয়েছি লোভে পড়ে। আমি সে সব রেখে যাব এই গুহাতে।
চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ এরকম করার পর আবহুল্লা চোখ খুলল। চোখটা খুলতেই তার মনে হোল দূরে একচিলতে যেন আলো।

কথাটা মনে হতেই সেইদিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল আবছুল্লা। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ খেয়াল হোল, তার মাথার উপর চাঁদ দেখা যাচ্ছে, ফুরফুর হাওয়া গায়ে লাগছে। তবে কি আবছুল্লা এখন গুহাটার বাইরে এসে গেছে? হ্যাঁ ভাল করে চারদিক তাকাতেই বুঝল, সত্যিই সে এখন খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে।

গুহার বাইরে আসতেই আবছুল্লার ভয় কেটে গেছে। আগে যে ভাবছিল, বুড়ো ফকিরের কথা না শুনে, লোভ করে হীরে, মোহর নিয়ে আসাতেই বুঝি সে বেরুবার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তার মনে হোল—হ্যৎ, বোকারাই ওসব ভাবে। এসব হীরে, মোহর পেয়েছি, এসব আমার। বুড়োটা কথামত পাবে লোহার বাতিদানটা ব্যাস্। আর পাওয়া জিনিষ এই হীরে, এসব হাতছাড়া করছিনে আমি। বাইরে এসে আবছুল্লা তাকাচ্ছে চারদিকে ইলবন বুড়োটা কোথায়? কোথায় সেই ফকির? কোনদিকেই ফকিরকে দেখতে পেল না। তখন ভাবল, ভালই হয়েছে, হীরে মোহরের সংগে এই লোহার বাতিদানটাও আমার হয়ে গেল। একথা ভেবে ডান হাতে বারো পিলসুজওয়ালা বাতিদান আর জোব্বার পকেটে হীরে-মোহর নিয়ে মনের স্থখে গান গাইতে গাইতে বাড়ীর দিকে ফিরে চলল আবছুল্লা। গান গাইছে আর ঠুক্ ঠুক্ করে মোমবাতিদানটার গায়ে তাল দিচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হোল যেন সে মাটি থেকে ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে যাচ্ছে। তাইতো! সত্যিইতো তাই। আবছুল্লা শূন্য দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে।

আবছুল্লা বলে উঠল—"একি রে বাবা। আমি পাখীর মত আকাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছি কি করে? আমি কি এমনি করেই ভাসতে ভাসতে বাড়ীতে পৌঁছে যাব?"

কি আশ্চর্য্য! কথা শেষ হওয়ার সংগে সংগে আবছুল্লা দেখে সে হু-হু করে ভেসে চলেছে আকাশ দিয়ে। জোরে, খুব জোরে।

আর সত্যিই মুহুর্ত্তের মধ্যে ধপ্ করে এসে পৌঁছাল তাদের গ্রামের সেই ছোট্টো কুঁড়েটার সামনে।
আবদুল্লাকে দেখে তার বুড়ীমা ছুটে এল। দুহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। গায়ে-মাথায়-মুখে হাত বুলাল। জিজ্ঞেস করল—"কেমন আছিস্ ?"
আবদুল্লা বলল—"আরে বাবা, খু—উব ভাল।" —এই বলে বাতিদানটা মাটিতে রেখে পরণের জোব্বার পকেট থেকে মোহর, হীরে সব বার করে মাকে দেখাল। বলল—"তার কাজে খুশী হয়ে বুড়ো ফকির এসব তাকে দিয়েছে।"
মা তো একথা শুনে খুব খুশী। আবদুল্লাও তখন মিথ্যে মিথ্যে করে বলতে সুরু করল কতরকম কঠিন কাজ তাকে করতে হয়েছে। সেই গুহার মধ্যে জন্তু জানোয়ারে সংগে তাকে কত ভীষণ লড়াই করতে হয়েছে। শেষে তবেই না এসব হীরে—মোহর পেয়েছে।
"সেই বুড়ো ফকির সাহেব কোথায় গেল ?"
"আমাকে এসব দিয়ে ফকির সাহেব দেশে চলে গেছে।"—এই মিথ্যে কথাটাও চট্ করে আবদুল্লা মাকে বলে দিল।
এদিকে আবদুল্লা যত মিথ্যে কথা বলছে ততই অল্প অল্প করে হীরে—মোহর হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষকালে যখন ফকির সাহেবের কথাটা বলল তখন—ঝম্—করে শব্দ হোল। আর আবদুল্লা তাকিয়ে দেখে মাটিতে রাখা সবগুলো হীরে-মোহর আকাশে ভাসতে ভাসতে শূন্যে মিলিয়ে গেল।
এই তাজ্জব ব্যাপার দেখে আবদুল্লার বুড়ীমাও চমকে গেছে। ভাবছে একি রে বাবা! হঠাৎ বুড়ীর মনে পড়ল তাইতো, ফকির সাহেব বলেছিল আবদুল্লা যতদিন সাচ্চা থাকবে, দয়ালু থাকবে, ততদিন কোনও বিপদ হবে না।—আজ এ বিপদ যখন হোল তখন আবদুল্লা কিছু মিথ্যে কথা বলেছে।
মার পেড়াপিড়ীতে আবদুল্লা স্বীকার করল সত্যি কথা। তখন বুড়ী

মা আবদুল্লাকে বলল—"এই বাতিদানও তোমার নয়। এটা ফকির সাহেবের। ঘরের কোণে এটাকে রেখে দাও। আর হীরে মোহর যখন ফকির সাহেব তোমাকে নিতে নিষেধ করেছিল তখন সেগুলো চলে গিয়ে ভালই হয়েছে।"
আবদুল্লার খুব লজ্জা হোল নিজের ব্যবহারে। মনে মনে বার বার বলল—"ফকির সাহেব। আমাকে ক্ষমা কর।"
সেদিনটা এমনি করেই শেষ হোল। সন্ধ্যে হোল। আবদুল্লাকে তার বুড়ী মা বলল—"হ্যারে সূর্য্য ডুবে আধার হোল, বাতি জ্বালা।"
আবদুল্লা ভাবল—ঘরে রয়েছে বার পিলসুজের মোমবাতিদানটা। লাগাই না এতে একটা মোমবাতি। মোমবাতি লাগানো মানে তো আর মোমবাতিদানটা চুরি করা নয়। এই ভেবে একটা মোমবাতি বসালো বাতিদানটায়। ফস্ করে তাতে আগুন জ্বালাল। মোমবাতিটার আগুনের শিখা একটু একটু করে বড় হোতে লাগল। সেই শিখা লম্বায় বড় হোতে হোতে অনেক উচু হয়ে গেল। আবদুল্লা আর তার মা অবাক হয়ে সেই শিখা দেখছে।
এমনি সময়ে হঠাৎ সেই শিখাটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল লিকলিকে চেহারার এক বুড়ো দরবেশ। মাথার লম্বা চুল পা পর্য্যন্ত নেমেছে। দাড়ি হাটু পর্যন্ত ঝুলছে। গলায় ঝিকমিক করছে মোতির মালা। লম্বা-লম্বা সরু হাত। নোখগুলো ভীষণ চোখা চোখা।
দরবেশটা মোমবাতির শিখা থেকে বেরিয়ে এসেই লাট্টুর মত বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল মোমবাতিটার চারপাশে। আর কিছুক্ষণ পর টুং করে শব্দ হোতেই একটা মোহর বেরিয়ে এল সেই দরবেশটার হাতে। আর চোখের পলকে দরবেশ সেই মোহরটা আবদুল্লার পায়ের কাছে রেখে শূণ্যে মিলিয়ে গেল। সংগে সংগে মোমবাতির লম্বা শিখাটাও টিমটিমে শিখা হয়ে জ্বলতে লাগল।
এই কাণ্ডকারখানা দেখে আবদুল্লার বুড়ী মা তো ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। আবদুল্লা কিন্তু ঘাবড়ায় নি। ভাবছে, তাইতো একটা মোমবাতি
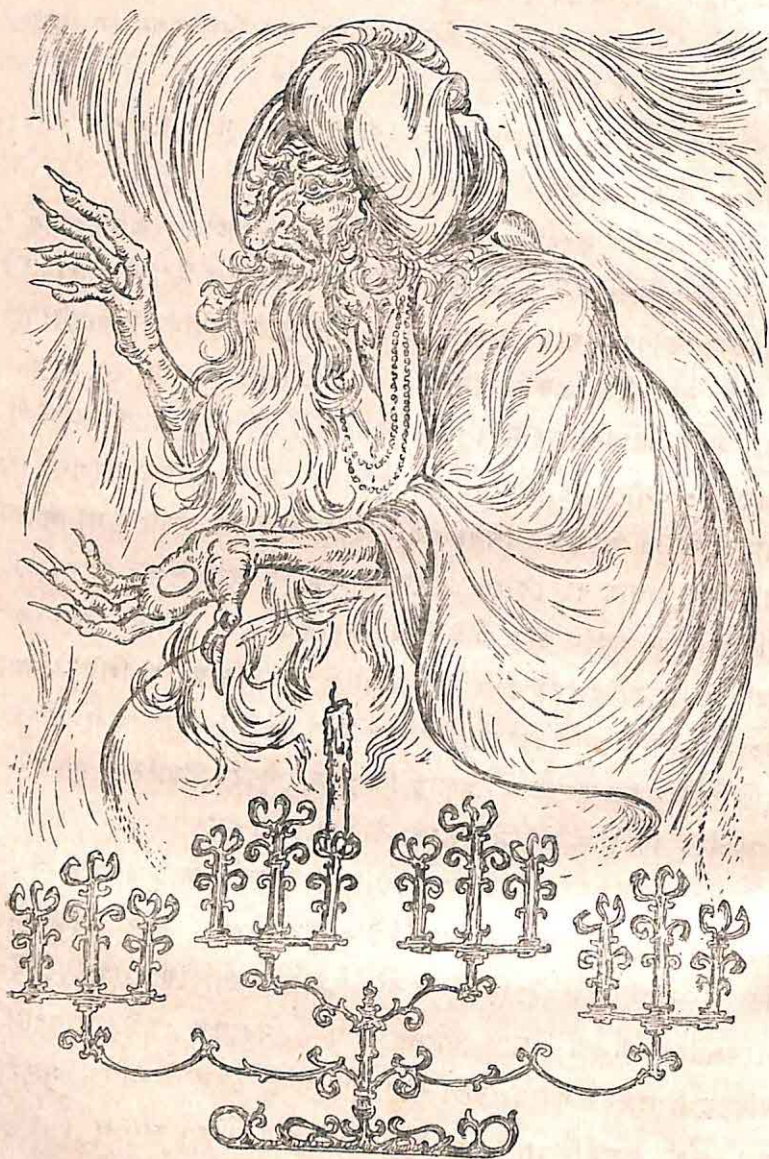
দরবেশটা মোমবাতির শিখা থেকে বেড়িয়ে এসেই—

জ্বালতে একটা মোহর পেলাম। যদি ঐ মোমবাতিদানটার বারোটা জায়গায় বারোটা মোমবাতি জ্বালি তবে কি হবে?
চিন্তায় সেই রাতে আর ঘুম এল না আবদুল্লার। পরদিন সকাল, দুপুর নানান উৎকণ্ঠায় কাটল আবদুল্লার। তারপর সন্ধ্যে হতেই বারোটা মোমবাতি লাগল বাতিদানের বারোটা জায়গায়। তারপর যেই না প্রথম মোমবাতিটা জ্বালানো, ঠিক আগের দিনের মত মোমবাতির শিখা থেকে বেরিয়ে এল দরবেশ। লাট্টুর মত বোঁ-বোঁ করে ঘুরল প্রথম মোমবাতিটার চারপাশে, তারপর টুক্ করে একটা মোহর আবদুল্লার পায়ের কাছে রেখে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এমনি করে বারোটা মোমবাতি থেকে বার হোল বারটা দরবেশ আর প্রত্যেকেই রেখে গেল একটা করে মোহর।
এসব দেখে আবদুল্লার মা বলল—"দেখ এসব মোহর তোর নয়। সব সেই ফকির সাহেবের। তুই এর থেকে একটা মোহর নে আর সব ফকির সাহেবের জন্য রেখে দে।"
আবদুল্লা বলল—"ঠিক আছে। না হয় একটা মোহরই খরচা করব।"—কিন্তু আবদুলা পরের দিন সন্ধ্যেবেলা আবার সেই মোমবাতিদানে বারোটা মোমবাতী জ্বালল। আর সংগে সংগে বারোজন দরবেশ এসে আবার বারোটা মোহর দিয়ে গেল। এমনি করে সাতটা দিন পার হয়ে গেল। প্রত্যেকদিন বারোটা করে মোহর পাওয়ায় আবদুল্লার মার দুঃখ-কষ্ট নেই। কিন্তু তাহলে কি হবে, আবদুল্লার মনে অশান্তির শেষ নেই। সে ভাবছে—ইস্, সেই ফকিরকে যদি একবার পেতাম তাহলে জানতে পারতাম এই মোমবাতিদানটায় আর কোনও যাদু আছে কিনা।
শেষকালে নিজেকে আর সামলাতে পারল না আবদুল্লা। সে বলল—" আম্মীজান, আমি মোমবাতিদানটা নিয়ে চললাম ফকির সাহেবের কাছে। যার জিনিষ তাকেই দিয়ে আসি গে।"
মা বলল—"ভাল বাছা, তাই কর।" মার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে পিঠে

কাপড়ের মধ্যে মোমবাতিদানটা বেঁধে, আবদুল্লা রওনা হোল। ফকরি ইলবন সাহেব কোন শহরে থাকত ফকিরই সেকথা একদিন আবদুল্লাকে বলেছিল। তাই সপ্তাহখানেক হাটবার পর এসে পৌছাল ইলবন ফকিরের শহরে।

দয়ালু ইলবন্ ফকির সাহেবকে সেই শহরের সবাই জানত। তাই ইলবন ফকিরের থাকবার জায়গায় চট্ করে এসে পৌছাল আবদুল্লা। কিন্তু ফকির সাহেবের থাকবার জায়গা দেখে তার আক্কেল গুড়ুম। একিরে বাবা! এ যে রাজপ্রাসাদ! সদর দরজায় জনাপঞ্চাশেক লোক পাহারা দিচ্ছে। চারদিকে কি জাঁকজমক!

আবদুল্লা সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে এখন কি করি? ফিরে যাব? ঠিক এমনি সময়ে একজন ভারী খুপসুরৎ তেজী চেহারার লোক, জমকালো পোষাক তার গায়ে, মাথায় জরীর টুপি, এসে দাঁড়ালো আবদুল্লার সামনে। বলল—"আসুন, আসুন, আবদুল্লা। ফকির ইলবন আপনার জন্যই অপেক্ষা করছেন। আবদুল্লাকে সেই রাজসিক চেহারার লোক প্রাসাদের ভিতর নিয়ে চলল। বাপ্‌রে, প্রাসাদের ঐশ্বর্য্য দেখে আবদুল্লারতো আর চোখে পলক পড়ে না। এক এক করে বারোটা ঘর পার হোল তারা। শেষকালে বিরাট এক ফুলের বাগানে এসে পৌছাল। দেখে সেই বুড়ো ইলবন ফকির সেখানে বসে।

আবদুল্লা ইলবনের কাছে গিয়ে বলল—" ফকির সাহেব, এই নাও তোমার মোমবাতিদান। বাপ্‌রে, কি কষ্ট করে ইঙ্গারাক্কা পাহাড়ের গুহো থেকে এটাকে নিয়ে এসেছি। তারপর তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পৌছেছি।"

ফকির ইলবন হাসল। সে তো জানেই এটা একদম মিথ্যে কথা। আবদুল্লার মতলব জানবার মত যাদুবিদ্যাও সে জানে। তাই বলল—"বাঃ, বাঃ, তুমি খুব সাচ্চা ছেলে। তা মোমবাতিদান আনলে, আর তার ক্ষমতা দেখবে না?"

আবদুল্লা একথা শুনে খুব খুশী। আর, এটাই তো তার মতলব। তাই বলল—"তা ফকির সাহেব তুমি যদি দেখাতে চাও, দেখাও।" ইলবন ফকির তার সেই রাজসিক চেহারার লোকটাকে বারোটা মোমবাতি আনতে বলল। মোমবাতি আনা হলে এক এক করে মোমবাতিদানের বারোটা জায়গায় তাকে বসানো হল। বারোটা মোমবাতিতে আগুন দিতেই বারোজন দরবেশ এসে হাজির হোল সেই মোমবাতির শিখা থেকে। এ পর্য্যন্ত দেখে আবদুল্লা একটুও চমকায়নি। এসবতো তার জানা।

কিন্তু যেই বারোজন দরবেশ এসে বোঁ-বোঁ করে লাট্টুর মত মোমবাতির চারপাশে ঘুরতে লাগল, তখন ফকির ইলবন একটা চড় মারল প্রথম দরবেশকে। সংগে সংগে দরবেশ ছিটকে পড়ল মেঝেতে আর ঝনঝন করে একরাশ মোহরে পরিণত হল। দ্বিতীয় দরবেশকে আঘাত করতে সে মাটিতে পড়েই হয়ে গেল একরাশ চুণী। তৃতীয় দরবেশ হয়ে গেল রুবী। চতুর্থজন হল পান্না, পঞ্চম জন হল মুক্তা, ষষ্ঠজন হল হীরে। এমনি করে বারোজন দরবেশ বারোটা হীরে চুণী মাণিক মোহরের স্তূপ হয়ে গেল।

এই দেখে আবদুল্লা হতবাক। ভাবছে—ইস্। আমি বারোটা মোহর পেয়েই খুশী। আর এখন এই বারোটা দরবেশ বারোটা স্তূপাকার হীরা-মাণিক—সোনা-দানা হয়ে গেছে। আবদুল্লা মনে মনে ভাবল—না, এই বাতিদান ইলবন কিছুতেই পাবে না।

রাত্রে ইলবন ফকির খুব আদর যত্ন করল। ভাল ঘরে, নরম বিছানায় শুতে দিল। মাথার কাছে সেই বাতিদানটা রাখল, বলল—"আবদুল্লা কাল সকালে এটা তোমার কাছ থেকে নেব।"

আবদুল্লা মাথা নেড়ে বলল ঠিক আছে। তারপর রাত যেই গভীর হোল সবাই যখন ঘুমে মগ্ন, তখন চুপি চুপি সেই যাদু মোমবাতিদানটা নিয়ে ইলবন ফকিরের প্রাসাদ ছেড়ে পালাল। না খেয়ে না দেয়ে প্রায় বিশ্রাম না করে আবদুল্লা সাতদিনের পথ ছুটে এল

চারদিনে। বাড়ীতে ফিরে এসে কারুর সংগে কথা না বলে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঘর বন্ধ করল।

মোমবাতিদানটা মেঝেতে রেখে বারোটা মোমবাতি জ্বেলে রাখল তার উপর। সংগে সংগে বারোজন দরবেশ এসে বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল মোমবাতিগুলোর চারপাশে।

আবদুল্লা এবার ভাবল—বুড়ো ইলবন হালকা হাতে দরবেশদের চাপড় মেরেছে। তাতেই অত হীরে জহরৎ সোনাদানা পড়ল। আমি না হয় আরো জোড়ে মারি, তাহলে আরও বেশী হীরে জহরৎ, মোহর সবকিছু দেবে এই দরবেশরা।

এই ভেবে ঘরের কোণে রাখা লাঠিটা তুলে ধাঁই ধাঁই করে বারোজন দরবেশকে পিটিয়ে দিল।

বারজন দরবেশ এবার মেঝেতে ছিট্‌কে না পড়ে ঠাই করে মেঝেতে লাফিয়ে পড়ল। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা লাঠি। তারপর বারোজন ধাঁ-ধাঁ করে পিটাতে লাগল আবদুল্লাকে।

মারের-চোটে আবদুল্লা প্রায় মরমর। তখন লাঠি হাতে সেই বারোজন দরবেশ আবদুল্লার চারপাশে ধেই ধেই করে নাচল আর বলল—"আমরা সাচ্চা লোকের জন্য হীরে জহরৎ, আর ঝুটা লোকের জন্য যম।' এই বলেই তারা শূন্যে মিলিয়ে গেল। আর তারই সংগে সেই যাদু মোমবাতিদানও অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফারুদিনের প্রতিশোধ

*

*

পারস্যের মহান শাহ জামসেদের নাম কে না জানে। জামসেদ ছিলেন যেমন পরাক্রমশালী, সাহসী, তেমনি দয়ালু। পারস্যের প্রজারা জামসেদকে তাদের শাহ হিসেবে পেয়ে বেশ সুখেই ছিল। জামসেদের ছিল এক ছেলে, যোহাক। যুবরাজ যোহাকও ছিল সুপুরুষ, তেজী আর সাহসী। সুখেই দিন কেটে যাচ্ছিল শাহ-জামসেদের।

কিন্তু ঐ যে, কথায় আছে, দিন সবার সমান যায় না, শাহ-জামসেদেরও হোল তাই। একদিন যুবরাজ যোহাক প্রাসাদের পূব-দিকের বাগানটায় বসে আছে। আর মনে মনে ভাবছে কবে পারস্যের শাহ হয়ে সিংহাসনে বসবো। যোহাকের চিন্তা শেষ হয়েছে কি না হয়েছে, হঠাৎ শোঁ শোঁ করে বাতাস বইতে সুরু করল। ঝন্-ঝন্ করে প্রাসাদের দরজা-জানলাগুলো ধাক্কা খেতে লাগল। আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। যোহাক ভাবল—একি রে বাবা! পরিষ্কার আকাশ। কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। ঝড়ঝঞ্ঝা এল কোথা থেকে? হঠাৎ সেই শনশনে হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আর কিছু বোঝবার

আগেই দেখতে পেল পাহাড়ের মত বিশাল কি যেন সামনে দাঁড়িয়ে। ভাল করে তাকাতেই যোহাক বুঝতে পারল বিরাটকায় এক দৈত্য তার সামনে দাঁড়িয়ে। ঘড়ঘড়ে বাজখাই গলায় দৈত্য বলল—"যোহাক, তোমায় আমি জলদি পারস্যের শাহ বানিয়ে দেব।"

যোহাক রেগেমেগে জিজ্ঞেস করল—"কে হে তুমি? খুব যে বড় বড় কথা বলছ। পারস্যের শাহ জামসেদ এখনও জোয়ান। জামসেদ জীবিত থাকতে তার ছেলে যোহাক শাহ হবে কি করে? তোমার কথায়?"

"হ্যাঁ, আমার কথায়। আমায় চেননা তাই ওকথা বলছ। শয়তানদের রাজা জিন ইবলিস কি না করতে পারে। আমি যদি চাই তবে এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি পারস্যের শাহ হয়ে বসবে। আর যদি না চাই, তবে তোমার বাবা জামসেদ আরও বিশ বছর বেঁচে থেকে রাজ্য চালাবে। বলহে ছোক্‌রা, কি চাও?"

শয়তানদের রাজা জিন ইবলিসের কথা শুনে যোহাক চিন্তা করতে সুরু করল—তাইতো, বাবা যদি আরও বিশ বছর বাঁচে তবে তো আমি প্রায় বুড়ো হয়ে যাব।

যুবরাজ যোহাকের থমথমে মুখটা দেখে ইবলিস বুঝতে পারল তার ওষুধ ধরেছে। তাই যোহাককে আর কিছু ভাবতে না দিয়ে বলে উঠল—"তাহলে ওকথাই থাকল যুবরাজ, তোমায় আমি সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই পারস্যের শাহ বানিয়ে দিচ্ছি। আর তার বদলে আমার পাওনা আমি ঠিক সময়েই নিয়ে নেব।"—কথা শেষ করেই শূন্যে মিলিয়ে গেল শয়তান জিন ইবলিস।

কয়েকদিনের মধ্যে হঠাৎ যুদ্ধ সুরু হোল পারস্যের শাহের সঙ্গে অন্য দেশের রাজার। শাহ জামসেদ বললেন—"যোহাক, সেনাপতি হয়ে না হয় তুমিই যুদ্ধে যাও। এই জোড়দার লড়াইয়ে অন্য কাউকে সেনাপতি করে পাঠাতে সাহস পাচ্ছি না।"

যোহাক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে লড়াইএর ময়দানে পৌছাল। শত্রুপক্ষের

বিশাল বাহিনী দেখে যোহাক তো ঘাবড়ে গেল। ভাবল—অল্প সৈন্য নিয়ে এদের সংগে পারব কি করে ?

কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! খেলনা পুতুলের মত শত্রুপক্ষের সৈন্যরা ঝট্‌পট্‌ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, প্রায় বিনাযুদ্ধেই। আদ্ধেক সৈন্য নিয়ে যোহাক যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরতে লাগল রাজপ্রাসাদে। আসল ব্যাপারটাতো কেউ বুঝতে পারেনি। শয়তানদের রাজা জিন ইবলিসের কারসাজীতেই যুদ্ধে জিতে গেল যোহাক।

যোহাক্‌তো রাজধানীতে ফিরছে জয়ী হয়ে। শাহ জামসেদ মহা খুশী। ছেলেকে আপ্যায়ন করার জন্য শহর ছেড়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন জামসেদ। কিন্তু শয়তান জিন ইবলিসের আবার কারসাজী সুরু হোল। ঘোড়া-শুদ্ধ্‌ এক চোরাগর্ত্তে পড়ে গেলেন শাহ্‌-জামসেদ। আর সংগে সংগেই মারা গেলেন।

সবাই ভাবলে এ বুঝি আল্লার মর্জি। জয়ী জোয়ান ছেলে শাহ হয়ে সিংহাসনে বসুক হয়ত আল্লা তাই চান, সেজন্যই বুড়ো জামসেদকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে নিলেন। তাই ধূমধাম করেই সবাই যোহাককে সিংহাসনে বসালো।

শাহ জামসেদের বদলে সিংহাসনে বসল যোহাক। বেশ ভালভাবেই রাজ্য চালাতে লাগল। প্রজারাও বেশ খুশী। মনের সুখে কয়েকটা-মাস কেটে গেছে। পারস্যদেশের শাহ বলে কথা। কত খাতির, কত আদর-যত্ন। আনন্দে-আরামে শাহ যোহাকের দিন কেটে যাচ্ছে। শয়তান জিন ইবলিসের কথা ভুলেই গেছে ততদিনে।

এদিকে শয়তান জিন ইবলিস মনে মনে বলল—হ্যাঁ, আমার পাওনা আদায় করার সময় হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ এভাবে গেলে তো বিপদ। কিন্তু আমার মাশুলটাতো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না।

অনেক চিন্তা করে, এক বাবুর্চ্চির ছদ্মবেশে জিন ইবলিস্‌ হাজির হোল শাহ যোহাকের দরবারে। শাহের খাওয়া-দাওয়া তদারকের জন্য কত লোকজন, কত বাবুর্চ্চি আছে। তাই ছদ্মবেশী ইবলিসকে

রাখতে রাজী হোল না শাহের মন্ত্রী।

ইবলিস তখন ঝট্ করে গিয়ে হাজির হোল দরবারে শাহ যোহাকের সামনে। বলল—"হুজুর, আপনি রাজ্যের সবার মা-বাপ। আপনি যদি আমাদের না রাখেন, তবে আমার খাওয়া-পরা চলবে কি করে। আপনি এক হপ্তার জন্য আমায় রাখুন। আমার হাতের রান্না পছন্দ না হলে তাড়িয়ে দেবেন।"

শাহ-যোহাক বলল—"মন্ত্রী, এই লোকটার কথাগুলো বেশ যুক্তিপূর্ণ। থাকুক না হয় লোকটা এক সপ্তাহের জন্য। তারপর ফয়সলা করব একে রাখা যাবে কিনা।"—ছদ্মবেশী ইবলিস শাহ যোহাকের রসুইখানায় বাবুর্চি হিসাবে সেদিন থেকেই রয়ে গেল।

প্রথম দিনেই ইবলিস করল কি কয়েকটি বুনোশুয়োর নিয়ে এল শিকারীদের কাছ থেকে। তারপর কুড়িটা মাটির কলসীতে কুড়ি রকম মশলাপাতি দিয়ে অদ্ভুত যাতু-আরক বানিয়ে রাখল। তারপর বুনো শুয়োরের মাংস রাঁধল সেই যাতু-আরক দিয়ে।

যাতু-আরকে তৈরী অদ্ভূত-স্বাদু মাংস খেয়ে শাহ যোহাক ভারী খুশী। সভাসদবর্গও সেই মাংসের স্বাদ পেয়ে আনন্দে চুক্‌চুক করে উঠল। শাহ যোহাক বললেন—"নাঃ, নূতন বাবুর্চিটা বেশ ভালই রান্না জানে দেখছি।"

কথাটা শুনে লজ্জার ভান করে মাথা নীচু করল শয়তান জিন ইবলিস। শুধু বলল—"শাহ যোহাকের করুণাই আমার সম্বল।"

দ্বিতীয় দিনে ইবলিস তৈরী করল কচ্ছপের মাংসের লোভনীয় স্যুপ। তাছাড়া তিতির পাখীর মাংসের কষা, আর ভেড়ার মাংসের মনোহারী রোষ্ট। এই রান্না খেয়েও যোহাক বারবার তারিফ করল।

তৃতীয় দিনে তৈরী হল ষাড়ের মাংসের রোষ্ট। এমন কায়দায় যাতুবলে রান্নাটা তৈরী করল ইবলিস যে যখন খাওয়ার টেবিলে ষাড়ের রোষ্টটা রাখা হোল, মনে হোতে লাগল যেন সত্যিকারের একটা ষাড় খাওয়ার টেবিলের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

শাহ-যোহাক খাওয়ার টেবিলে বসেই চমকে উঠল। আরে ব্যাস্, একি রে! তারপর রান্না খেয়ে সত্যিই তার মাথা ঘুরে গেল। শাহ বলে উঠল—"এ রাঁধুনিকে আর ছাড়া যায় না। লোকটা এত ভাল রাঁধে যে ওকে পুরস্কার না দিলেই চলবে না।"
এই কথা বলে যোহাক ছদ্মবেশী শয়তান জিন ইবলিসের দিকে তাকাল। বল্ল—"হ্যাঁহে, বল কি পুরস্কার চাও?"
ইবলিস যেন খুব লজ্জা পেয়েছে এমন ভান করে বলল—"দয়ালু শাহ যে আমাকে পছন্দ করেছেন সেটাইতো আমার পুরস্কার। তবে অন্য পুরস্কার না দিতে পারলে যদি অখুশী হন তবে দয়া করে আমাকে আপনার দুই কাঁধে একটা করে শ্রদ্ধা চুম্বনের আদেশ দিলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"
শাহ যোহাক মনে মনে বল্লে—ভারী পাগল দেখছি লোকটা, আমার কাঁধে চুম্বন করলেই ধন্য হয়ে যাবে? হোক্, যখন এই পুরস্কারই চাই তাই দেয়া যাক্।
শয়তান জিন ইবলিস শাহ যোহাকের দুই কাঁধে ছোট্ট করে দুটো চুম্বনরেখা এঁকে প্রাসাদের ভিতরে চলে গেল। তারপর সবার অলক্ষ্যে প্রাসাদ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।
এদিকে রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শাহ যোহাক বিশ্রাম করতে গেছে। কিন্তু নরম বিছানায় শুয়েও শরীরে ভীষণ অস্বস্তি। রাঁধুনে ইবলিস কাঁধের যে দু—জায়গায় আলতো ভাবে চুমু খেয়ে গেছে সেখানের জ্বালাটা যেন ভীষণ তীব্র।
শাহ যোহাক আর থাকতে না পেরে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। ঘরের কোণে রাখা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আর আয়নায় ভাল করে তাকাতেই চোখদুটে ভয়ে—বিস্ময়ে গোলগোল হয়ে গেল। কাঁধের ঐ জায়গা দুটো থেকে দুটো সাপ তাদের লিকলিকে জিভ বার করে হিস্-হিস্ শব্দ করছে।
যোহাক দৌড়ে গিয়ে তার শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল যাতে

কাঁধের দু-জায়গা থেকে দুটো সাপ হিস্-হিস্ শব্দ করছে

ঘরে কেউ না ঢুকতে না পারে। মাথার দু-পাশে, কাঁধের উপর সাপ দুটো হিস্-হিস্ শব্দ করছে—এই চেহারার রাজসভায় বসবে কি করে? ভয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে গেছে শাহ যোহাক।
অল্প-চিন্তা করতেই যোহাক বুঝতে পারল রাঁধুনেটা আর কেউ নয় ছদ্মবেশী ইবলিস। তাই ইবলিসের যাদুতে কাঁধের দু-জায়গায় দুটো সাপ গজিয়েছে। এই বিপদ থেকে একমাত্র ইবলিসই তাকে বাঁচাতে পারে।
যোহাক যখন এইসব ভাবছে হঠাৎ কানে এল কাঁধের কাছের সাপ-দুটো হিস্ হিস্ করে দুকানে বলছে—"দেখ বাপু, প্রত্যেকদিন সকালে দুটো করে লোক এনে দেবে আমাদের খাদ্য হিসেবে। আর তা যদি কর সেদিনের মত তোমার কাঁধের চামড়ার নীচে আমরা চুপ করে লুকিয়ে থাকব। মনে রেখো, প্রত্যেকদিন দুটো করে লোক। আর যেদিন দুটো লোক পাব না সেদিন ফস্ করে মাথা উচু করে কাঁধের উপর বেরিয়ে পড়ব।"
শাহ-যোহাককে একথাতে রাজী হতেই হোল। তা নাহলে কাঁধে—সাপওয়ালা এই যোহাককে শাহ বলে কে আর মানবে।
মন্ত্রীর তলব পড়ল। হুকুম হোল—"প্রত্যেকদিন সকালে দুজন লোককে বন্দী করে আমার এই ঘরে দিয়ে যেতে হবে। কেন, এইসব কারণ যে জিজ্ঞাসা করবে, তার গর্দান যাবে।"
মন্ত্রী বেচারা কথাশুনে বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল। প্রত্যেকদিন দুটো করে লোক চাই শাহ-যোহাকের। শেষকালে শাহের মাথাটা খারাপ হোল নাকি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই যে গর্দান যাবে। যোহাকের আদেশমত প্রত্যেকদিন দুটো করে বন্দী নিয়ে আসা হোল যোহাকের শয়ন ঘরে। তারপর তাদের কি হোল কেউ জানল না। দুটো করে লোক, প্রত্যেকদিন রাজ্যে কমে যেতে লাগল। শাহের রাজ্যে হাহাকার সুরু হোল। প্রত্যেকেই ভয়ে ভয়ে থাকে, কি জানি, কার বাড়ীর লোককে ধরে নিয়ে যাবে শাহের লোক।

কিন্তু শাহ-যোহাককে বাধা দেবার সাহস কার?

একদিন রাতে যোহাক ঘুমিয়ে আছে বিছানায়। এক বিশ্রী স্বপ্নে ঘুম ভেঙ্গে গেল। যোহাক স্বপ্নে দেখলো তিনজন অশ্বারোহী যোদ্ধা যেন তাকে আক্রমণ করেছে। ওদের মধ্যে, মাঝখানের যোদ্ধা দেখতে যেমন সুপুরুষ, চেহারাও তেমনি তেজী। তার ডান হাতে লোহার বল্লম, বল্লমের মাথায় ষাড়ের মাথা লাগানো। সেই সুপুরুষ যোদ্ধার বল্লমের আঘাতে শাহ যেন মাটিতে ছিট্‌কে পড়ল। তারপর তার গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে সেই যোদ্ধা তাকে পশুর মত যেন টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগল।

স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেছে শাহ যোহাকের। এরপর কি আর চোখে ঘুম আসে, না মনে শান্তি থাকে? পরের দিন সকালেই ডাক পড়ল বৃদ্ধ রাজ-জ্যোতিষীর, আর স্বপ্ন-বিষারদের।

সবকথা শোনার পর স্বপ্নবিষারদ বললেন—"শাহ, এ সত্যিই চিন্তার কথা। আপনার পতন হবে ঐ চেহারার কোন এক অজানা তরুণ যোদ্ধার হাতে।"

শাহ-যোহাক বলল প্রধান রাজ জ্যোতিষীকে—"দেখুনতো, সেই অজানা যোদ্ধা কোথায় আছে?"

বৃদ্ধ রাজজ্যোতিষী বহু আঁক-জোক, হিসাব-নিকাশ করলেন। তারপর বললেন—"শাহ, এই অজানা যোদ্ধার নাম ফারুদিন। সে কিন্তু এখনও জন্মায়নি। তবে সেই ফারুদিনের হাতেই আপনার পরাজয় আর মৃত্যু হবে। তারপর ফারুদিন হবে পারস্যের রাজা।"

শাহ-যোহাক চেঁচিয়ে উঠল—"ফারুদিন আমায় মারবে কেন? ফারুদিনের কি ক্ষতি আমি করেছি?"

রাজজ্যোতিষী বললেন—"ফারুদিন জন্ম নেবে আপনার অত্যাচার থেকে, পারস্যের এই জনপদকে বাঁচাবার জন্য। প্রত্যেকদিন দুজন করে লোক আপনার খেয়ালখুশীর জন্য যে মারা যাচ্ছে তাদের অভিশাপ থেকেই জন্ম নেবে ফারুদিন, আপনার অত্যাচারকে বন্ধ

করার জন্য। প্রজাদের সুখী রাখবে সেই ফারুদিন।"

শাহ-যোহাক রাগে চেঁচিয়ে উঠল—"আহম্মক জ্যোতিষী, পারস্যের শাহকে ভয় দেখানো হচ্ছে? উপদেশ দেওয়া হচ্ছে? মন্ত্রী, এই ভণ্ড বুড়ো-জ্যোতিষীটাকে এক্ষুনি শূলে চড়াও।"

বৃদ্ধ-প্রধান-রাজজ্যোতিষীকে সবাই শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত পারস্যের সবাই জানে সত্যি ছাড়া কোন কথাই এই বৃদ্ধ-জ্যোতিষী বলেন না। রাজ্যের মঙ্গল, প্রজার মঙ্গলের জন্য বৃদ্ধ-রাজজ্যোতিষীর মন কতটা ব্যগ্র।

রাজদরবারের সবাই ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকল রাজজ্যোতিষীর দিকে। শূলে জ্যোতিষীকে চড়ানো হোল। তখন বৃদ্ধ রাজজ্যোতিষী শেষবারের মত শাহ-যোহাকের দিকে তাকিয়ে বললেন—"যোহাক, তোমার নিহন্তার জন্মলগ্ন আগত। আমার মৃত্যুর সংগে সংগেই আমারই আত্মা ফারুদিনের রূপ নিয়ে জন্ম নেবে তোমাকে ধ্বংস করার জন্য।"—বৃদ্ধ-রাজজ্যোতিষী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

শাহ-যোহাকের মনের সব সুখ শান্তি শেষ হয়ে গেছে। সেনাপতির ডাক পড়েছে। রাজ্য-জুড়ে খোঁজাখুঁজি চলছে সব নবজাতকদের। শাহের আদেশে প্রত্যেক নবজাতককে মেরে ফেলা হচ্ছে। কোন্ নবজাতক যে ফারুদিন হবে, কে জানে? শাহ যোহাক শত্রুর শেষ রাখতে চায় না। যোহাক এক অমানুষ-অত্যাচারী শাহ হয়ে উঠল শয়তান জিন ইবলিসের নোংরা যাদুবিদ্যার কারসাজীতে।

ওদিকে ফারুদিন জন্ম নিয়েছে একবুড়ো চাষীর ঘরে। ভারী সজ্জন, সৎ মানুষ এই চাষী আর তার বৌ। আল্লার নাম করেই সুখে তারা দিন কাটায়। তাদের কোন ছেলেপিলে ছিল না এই যা দুঃখ। কিন্তু মুখে তারা সবসময় একই কথা বলত—"আল্লা যা করেন মংগলের জন্য।"

ফারুদিনের জন্মের পরের দিন রাতেই বুড়ী চাষীমা স্বপ্ন দেখল এক দরবেশ যেন তাকে বলছে—"বেটি, উঠে পড়। নবজাত ছেলেকে

নিয়ে ভোর হবার আগেই এ্যালবুর্জ পাহাড়ে পালিয়ে যা। তোর সামনেই ভীষণ বিপদ।"

স্বপ্ন দেখে ধরফর করে উঠে পড়ল চাষী-মা। উঠে দেখে বুড়ো চাষীও উঠে বসেছে। চাষী বৌ তার স্বপ্নের কথা স্বামীকে বলল। স্বামী বলল—"এই স্বপ্ন আমিও দেখলাম। তাইতো উঠে বসেছি। যাও ছেলেকে নিয়ে এই রাতেই পালাও এ্যালবুর্জ পাহাড়ের দিকে। আল্লা তোমাদের সহায় হোন।"

ছেলে ফারুদিনকে নিয়ে ভোর হবার আগেই চাষীবৌ এসে পৌছাল এ্যালবুর্জ পাহাড়ের নীচে। ওখানে বাস করত ধার্মিক এক মেষপালক। চাষীবৌ মেষপালককে সবকথা বলল। তারপর অনুরোধ করল—"বাপজান এই ছেলেটাকে তোমার কাছে রাখ। তা না হলে শাহ্-যোহাকের শ্যেণ-দৃষ্টি থেকে একে বাঁচানো যাবে না।" মেষপালক-বৃদ্ধ বলল—"বেটি, রেখে যা তোর ছেলে ফারুদিনকে। এ বুড়োর শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ তোর ছেলে ফারুদিনের কোন ভয় নেই।"—চাষীবৌ ধন্যবাদ জানাল বৃদ্ধ মেষপালককে, তারপর এ্যালুবুর্জ পাহাড়ের অন্যদিকে পালিয়ে গেল। এদিকে শাহ-যোহাকের কানে ঠিক খবর পৌছে গেছে ফারুদিন বুড়ো চাষীর ঘরে জন্ম নিয়েছে। সৈন্য-সেপাই এসে হাজির চাষীর ঘরে। কিন্তু চাষী-বৌ আর তার ছেলে ফারুদিন তখন নাগালের বাইরে। সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেল বুড়ো চাষীকে। হাত-পা বেঁধে চাষীকে বন্দীশালায় রেখে দিল। তারপর চল্ল ভীষণ অত্যাচার। কিন্তু ফারুদিনের খবর একফোটাও বার করতে পারা গেল না বুড়ো বাপের কাছ থেকে।

এদিকে ধীরে ধীরে সময় পার হতে লাগল। তিনটে বছর পার হয়ে গেছে। ফারুদিন মেষপালকের কাছে আদরেই মানুষ হচ্ছে। এ্যালবুর্জ পাহাড়ের খোলা হাওয়ায় গরু-ছাগলের খাঁটি দুধ খেয়ে বেশ সতেজ ছেলে হয়ে উঠছে সে। এমনি সময়ে একদিন ফারুদিনের

মা এসে হাজির।
বুড়ো মেষপালক বলল—"বেটি তুই! তোর ছেলেতো সুখেইআছে।"
"কিন্তু বাপপজান কাল রাতে যে ভারী খারাপ স্বপ্ন দেখলাম আবার। শাহের সেনা যেন তোমায় ধরে নিয়ে গেছে। তাই যদি হয়, তবে তো ফারুদিনকেও ধরে নিয়ে গিয়ে কোতল করবে।"
"বেটি সত্যিইতো বড় খারাপ স্বপ্ন। তবে নিয়ে পালা ফারুদিনকে। হ্যাঁ, অন্য কোথাও যাস নে বেটি। তুই বরং এই পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলে যা দামাভেণ্ড অগ্নেয়গিরির কাছে। দেখবি দামাভেণ্ডের গুহায় এক বুড়ো দরবেশ থাকে। ওখানেই তোরা লুকিয়ে থাকবি। দামাভেণ্ডের আগ্নেয়গিরি বড় ভয়ংকর। হঠাৎ যখন জেগে উঠে তখন দুপাশের জনপদ ভেঙ্গে-চুরে দিয়ে যায়। তাই ভয়ে কেউ দামাভেণ্ডে যায় না। তোরা ওখানেই চলে যা বেটি।"
ফারুদিনকে নিয়ে চাষীবৌ চলে এল দামাভেণ্ডে। দরবেশ সবকথা-শুনে ফারুদিন আর তার মাকে আশ্রয় দিল।
ওদিকে চাষীবৌ-এর স্বপ্নদেখার ঘটনা একদম সত্যি হয়ে গেল। এ্যালুবর্জ পাহাড় ছেড়ে চলে আসার পরদিনই শাহ-যোহাকের সৈন্যদল গিয়ে পৌছাল মেষপালকের কাছে। বলল—"ওরে বুড়ো, ফারুদিনরা কৈ?"
"ফারুদিন বলে বাপু আমি কাউকে চিনি না।"
"চিনিস না? তবে দেখাচ্ছি মজা।"—এই বলে যোহাকের সৈন্যদল মেষপালকের সব গরু-ছাগল ধরে নিয়ে গেল। কুড়ে ঘর ভেঙ্গে তছনছ করেদিল। মেষপালকের মুণ্ডুটাও কেটে নিয়ে চলে গেল।
মেষপালকের মৃত্যুর খবর ঠিক পৌছে গেল দামাভেণ্ডে, দরবেশের কাছে। আর তারপর সে খবর জানল ফারুদিনের মা। চাষী-বৌ দুহাত জুড়ে বলল—"আল্লা, আমার ফারুদিনের জন্য মেষপালক বাবা মারা পড়ল। শাহের অত্যাচার আর কতকাল চলবে, তুমিই বল আল্লা?"

দরবেশ স্নিগ্ধ হেসে বললেন—"বেটি, ধৈর্য্য ধর। ঠিক সময়ে ঠিক কাজই করেন আল্লা। অযথা উতলা হোস নে বেটি।"
ফারুদিন ধীরে ধীরে বড় হল। সতেজ জোয়ান হয়ে উঠল। মনের সুখে দামাভেণ্ডের পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ঘুরে বেড়ায়। একদিন এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে ফারুদিন। হঠাৎ কানে এল মেঘের মধ্যে দিয়ে কথা ভেসে আসছে—"ফারুদিন, এবার তোমার প্রস্তুত হবার সময় হয়েছে। পারস্যের অত্যাচারী শাহ যোহাককে সরিয়ে তোমাকেই পারস্যের সিংহাসনে বসতে হবে।"
ফারুদিন অবাক হয়ে তাকাল আকাশের দিকে। এসব কথা কে বলছে তাকে? হঠাৎ দেখে আকাশ থেকে একটা মেঘ ধীরে ধীরে পাহাড়ের চূড়ার দিকে নেমে এল। মেঘের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল বিশালকায় এক পুরুষ।
"কে তুমি?"—
"ভয় পেও না ফারুদিন। আমিই হচ্ছি উপকারী জিন্। শাহ-যোহাককে ভর করে আছে শয়তান জিন ইবলিস। তাকে ধ্বংস করার জন্যই আমার আবির্ভাব। তোমার সাহায্যেই যোহাক আর ইবলিসকে আমি ধ্বংস করব। আর তারপর তুমি হবে পারস্যের দয়ালু শাহ-ফারুদিন।"
"তা আমায় করতে হবে কি? এতবড় শক্তিশালী শাহ-যোহাককে পরাস্ত করা তো খুব সোজা কথা নয়।"
"সেজন্যইতো এসেছি ফারুদিন। আজ থেকে যুদ্ধকৌশল, অস্ত্র বিদ্যা, মল্লবিদ্যা, যাদুবিদ্যা সব কিছুই তোমাকে শিখতে হবে যোহাকের সংগে লড়াই করবার জন্য।"
এরপর সুরু হল ফারুদিনের শিক্ষা। প্রতিদিন সকালে ফারুদিন দামাভেণ্ডের পাহাড়ের চূড়ায় চলে আসে। সেখানে এসে হাজির হয় সেই উপকারী জিন। তারপর চলে নানান শিক্ষার পালা। এমনি করে একটা বছর পার হয়ে গেল।

ফারুদিন এখন ভালো যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। বয়স তখন মাত্র ষোল বছর। কিন্তু ধারালো মুখের চেহারা, ঈগলের মত তীক্ষ্ণ চোখ, দেখলেই অবাক হোয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় ফারুদিনের দিকে। উপকারী জিন একদিন বলল—"ফারুদিন, এবার প্রতিশোধ নেবার জন্য রওনা হও। মনে রেখো তোমার বুড়ো বাবা এখনও বন্দী হয়ে আছে শাহ-যোহাকের কারাগারে।"
ফারুদিন বুড়ী মার কাছে গিয়ে বলল—"মা, এবার শাহ-যোহাকের সংগে লড়তে যাচ্ছি। বাবাকে উদ্ধার করতে হবে তো। মেষপালক দাদুকে যে মেরে ফেলেছে তাকে শায়েস্তা করতে হবে না?"
"এইটুকু ছেলে, খালি হাতে তুই শক্তিশালী শাহের সংগে লড়বি কি করে?"—ভয়ে চাষীমা কান্নাকাটি আরম্ভ করল।
"আল্লা আমার সহায়। উপকারী জিন আমার সাথী। কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না মা, দেখো।"—এই কথা বলে ফারুদিন দামাভেণ্ড পাহাড় ছেড়ে রওনা হোল।
পথে যেতে যেতে ভাবল—তাইতো, খালি হাতে এরকমভাবে গেলে আমাকে দেখে কেউতো ভয় পাবে না। তখন ফারুদিন করল কি এ্যালুবর্জ পাহাড়ের কাছে এসে নূতন সাজে নিজেকে সাজাল। মাথায় পড়ল এক শিরোস্ত্রান। তাতে রঙ-বেরঙের পাথর বসালো। ডান হাতে নিল এক বল্লম, বল্লমের মাথায় লাগালো একটা ষাড়ের মুণ্ড। সোনালী রঙের আস্তরণে শরীরকে ঢাকল।
উপকারী জিনের পরামর্শমত এবার রওনা হোল জামসেদের সেই বিশাল শহরটার দিকে। বারোটা থামওয়ালা সিংহ-দরজার কাছে এসে পৌছাল ফারুদিন। ফারুদিনের সতেজ চেহারা, ডানহাতে অদ্ভুত অস্ত্র, জমকালো পোষাক দেখে পথের লোকেরা তার পেছনে পেছনে আসতে লাগল।
শেষকালে ফারুদিন এসে পৌছাল শহরের প্রধান বাজারটার কাছে। চারপাশে প্রচণ্ড ভীড়। সবাই ঘিরে ধরেছে ফারুদিনকে। সব্বাই

বল্লমের মাথায় বসালো এক ষাড়ের মুণ্ডু

জিজ্ঞেস করছে—কে তুমি,—কি চাই তোমার ?
ঠিক এমনি সময়ে আকাশ থেকে উপকারী জিন বলে উঠল—এই হচ্ছে বীর ফারুদিন। পারস্যের নূতন শাহ। অত্যাচারী যোহাকের হাত থেকে পারস্যকে বাঁচাবার জন্য আল্লা-প্রেরিত বীর। তোমরা সবাই ফারুদিনকে সাহায্য কর।
শাহ-যোহাকের অত্যাচারে পারস্যের সবাই রেগে ছিল। তারা বহুদিন ধরে শুনে আসছিল ফারুদিন জন্ম নিয়েছে এই অত্যাচারী যোহাককে ধ্বংস করার জন্য। আজ ফারুদিনকে দেখবার পরই সবাই তার ভক্ত হয়ে গেল। একে একে সবাই এসে জড় হোল ফারুদিনের কাছে।
বিশাল লোকজনের বাহিনী নিয়ে ফারুদিন এগুতে লাগল শাহ-যোহাকের রাজ-প্রাসাদের দিকে। দীর্ঘ পথ চলতে যাতে কষ্ট না হয়, সেজন্য লোকজনরাই ফারুদিনকে এনে দিল ধবধবে চেহারার একটা ঘোড়া। রাজ্যের দুই বীর যোদ্ধা অশ্ব নিয়ে চলতে লাগল ফারুদিনের পাশাপাশি যাতে হঠাৎ কোনও শত্রু ফারুদিনকে আঘাত করতে না পারে।
চলতে চলতে তারা এসে পৌঁছাল টাইগ্রীস নদীর সামনে। কি জলস্রোত সেই টাইগ্রীস নদীর। সবাই মুষড়ে গেল এতে। সামনে কোনও সেতু নেই, তাহলে এই টাইগ্রীস্ পার হবে কি করে তারা ? ফারুদিন কিন্তু ঘাবড়ালো না। সে আকাশের দিকে দুহাত তুলে বলল—"আল্লা আমাদের সহায় হোন্। উপকারী বন্ধু জিন আমাদের সহায় হও।"—এই বলে তার সাদা ঘোড়া নিয়ে টাইগ্রীস নদীর উপর লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, টাইগ্রীস নদীর জল ফারুদিনের ঘোড়াকে স্পর্শও করল না। বরং সেই সাদা ঘোড়া যেখান দিয়ে যেতে লাগল, সেখানেই একটা সেতু তৈরী হয়ে গেল। এবার সেই সেতু দিয়ে ফারুদিনের লোকজনেরা টাইগ্রীস নদী পার হোয়ে এল। শেষকালে শাহ-যোহাকের রাজপ্রাসাদের বিরাট দূর্গের সামনে এসে

পৌছাল ফারুদিন। কিন্তু এই বিশাল দুর্গ ভেদ করে ভিতরে ঢুকবে কি করে? সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। এমনি সময়ে আকাশ থেকে উপকারী জিনের কথা ভেসে এল—ফারুদিন, তোমার ডান হাতের ঐ বল্লমে আমার যাদুমন্ত্র দিয়ে দিয়েছি। ঐ ষাড়ের মুণ্ড-ওয়ালা বল্লম দিয়ে দুর্গে আঘাত কর, দেখবে দুর্গের দেওয়াল ভেঙ্গে যাবে। কথামত ফারুদিন বল্লম দিয়ে আঘাত করল দুর্গের। তাসের ঘরের মত দেওয়াল ভেঙ্গে। ফারুদিনের দলবল নিয়ে প্রাসাদে ঢুকে পড়ল।

এদিকে শাহ-যোহাকের কানে ফারুদিনের এই অভিযানের কথা আগে থেকেই এসে পৌছেছে। উপায়ান্তর না দেখে যোহাক শয়তান জিন ইবলিসের সাহায্য চাইল। কিন্তু শয়তান জিনের সব শয়তানী ঠাণ্ডা করল উপকারী জিন। শয়তান জিন ইবলিস উপায়ান্তর না দেখে যোহাক-কে ছেড়ে পালাল। আর তার সংগে সংগেই যোহাকের কাঁধের সাপদুটোও অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন অসহায় যোহাক। ঠিক সেই মুহূর্তেই এসে পৌছাল ফারুদিন। দৈববানী হল আকাশ থেকে—ফারুদিন, বন্দী কর অত্যাচারী যোহাককে। কারাগারে নিক্ষেপ কর। পিতাকে উদ্ধার কর। তুমিই পারস্যের নতুন শাহ—দয়ালু ফারুদিন।

সমস্ত জনগণ আনন্দে উল্লসিত হোল। জনগণের বিচারে বন্দী যোহাকের মৃত্যুদণ্ড হোল। ফারুদিন পারস্যের নূতন শাহ হয়ে সিংহাসনে বসল।

ফারুদিনের চাষী বাবা-মায়েরও দুঃখের দিন শেষ হোল।

তীরন্দাজ বাইজান

পারস্য দেশে তখন বিখ্যাত সুলতান কৈ-খসরু রাজত্ব করছেন। খসরুর রাজত্বকালে পারস্যের লোকজনেরা খুব সুখে শান্তিতেই ছিল। বিখ্যাত সেনাপতি রুস্তম দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা তদারক করছে। ফলে সেনাপতি রুস্তমের ভয়ে বিদেশী কোনও রাজা পারস্যের সুলতান কৈ-খসরুর রাজ্য আক্রমণ করতে সাহসী হোত না। কাজেই খসরু বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে, সুখেই ছিলেন।

কিন্তু এরই মধ্যে অন্য দূর্যোগ এসে উপস্থিত। পারস্যের উত্তর দিকে আমন দেশে এক বিদঘুটে উপদ্রব সুরু হয়েছে। বুনো শুয়োরের পাল কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে—হাজারে হাজারে। আমন দেশের সমস্ত খামার তছনছ করে দিচ্ছে। বুনো শুয়োরের হাত থেকে খামারকে বাঁচাতে না পারলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য।

সুলতান কৈ-খসরু এই খবর পেয়ে ভাবতে বসলেন—তাইতো, বুনো-শুয়োরের মত হিংস্র হাজার-হাজার জানোয়ারের সংগে লড়াই

করতে কাকে পাঠাই ? এ তো আর অন্যরাজ্যের সৈন্যসামন্তের সংগে লড়াই নয় যে সেনাপতি বীর রুস্তমকে পাঠাবো।
সুলতান বহুক্ষণ চিন্তা কোরে বল্লেন—না, সেনাপতি রুস্তমের মতামতটাই নিই। খবর গেল বীর রুস্তমের কাছে। রুস্তম এসে বল্ল—'সুলতান, বুনো শুয়োরের সংগে লড়াই করতে হোলে চাই যেমন সাহস, তেমনি হওয়া চাই ভালো তীরন্দাজ। এ রাজ্যে দুজনকে সেরা তীরন্দাজ বলে সবাই জানে। একজন বুড়ো গিরগিন্ আর অন্যজন ছোকরা বাইজান।'
কৈ-খসরু কথাটা শুনে বলে উঠলেন—'বাহ্, ভালই হয়েছে। এবার সত্যিই পরীক্ষা হোয়ে যাবে কে বড় তীরন্দাজ—ছোক্‌রা বাইজান, না অভিজ্ঞ বুড়ো গিরগিন্। আমন দেশে শুয়োর শিকারের জন্য দুজনকেই পাঠানো হোক।'
কাথাটা শুনে মাথা নাড়ল সেনাপতি বীর রুস্তম। কিন্তু সংগে সংগে একথাও বল্ল—'সুলতান, আপনি দেখবেন ছোকরা বাইজানই বেশী শুয়োর মারবে। ওর হাতের তীর যেমন চোখের পলকের আগে চলে তেমনি ওর নিজের চলাফেরাও বিদ্যুতের মত দ্রুত। শুয়োর মারতে যে যে গুণ থাকা দরকার বাইজানেরই তা আছে।
বীর রুস্তমের কথা শুনে মুচকি হাসলেন সুলতান কৈ-খসরু। বললেন—'জানি, জানি সেনাপতি তুমি এসব কেন বলছ। ছোকরা বাইজান যে তোমরা বড় পেয়ারের তীরন্দাজ। কিন্তু দেখো জোয়ান হোলেই সবসময়ে জেতা যায় না। অভিজ্ঞতাটাই বড় জিনিষ। দেখো, বুড়ো গিরগিনই শুয়োর মারবে বেশী।'
সুলতানের কথার বিশেষ কোনও প্রত্যুত্তর করল না সেনাপতি রুস্তম। শুধু বলল—'সুলতান, তাহলে ডাকি দুজনকে। ওরা আমন থেকে ফিরলেই প্রমাণ হোয়ে যাবে কে বড় তীরন্দাজ।'
এরপর ডাক পড়ল বুড়ো গিরগিনের আর জোয়ান বাইজানের। রুস্তম ভাল কোরে বুঝিয়ে বলল—'দেখো বাপু শুয়োরের পালকে

নিঃশেষ না কোরে ফিরো না। আর এটাও মনে রেখো, যে বেশী শুয়োর মারতে পারবে সুলতান তাকেই সেরা তীরন্দাজের খেতাবটা দেবেন। তোমাদের দুজনের মধ্যে সেরা তীরন্দাজের পদটা নিয়ে লড়াই-এর ফয়সলা হবে এবার।

গিরগিন্ আর বাইজান কথাটা শুনে খুশীমনেই আমন দেশের দিকে রওনা হল। গিরগিন্ মনে মনে ভাবছে এই হচ্ছে আসল সুযোগ বাইজানটাকে সিধে করার। সেদিনের ছোকরা, সে কিনা আমার সমান তীরন্দাজ হোতে চায়? এ সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। যেভাবে হোক এবার জিততেই হবে।

আর ওদিকে ছোকরা বাইজান ঘোড়ার পিঠে চড়ে গুনগুন করে গাইতে গাইতে চলেছে আর মাঝে মাঝে বলছে—'ভালই হয়েছে খুড়ো, এবার পরীক্ষা খুব সিধেসাধা। যার হাতে বেশী শুয়োর মরবে সেই জিতবে। তুমি জিতলে তুমি হবে পয়লা নম্বর। আর আমি জিতলে আমি হব এক নম্বর।'

—'না, না, দেখবি ছোকরা তুই কিছুতেই জিততে পারবি না।'—রেগে চেঁচিয়ে উঠে বুড়ো গিরগিন্।

বুড়োর রাগ দেখে ছোকরা বাইজান হো-হো করে হেসে উঠে। বলে—'আ-হা, ক্ষেপছ কেন খুড়ো। তুমিইতো জিতবে। তারপর হাততালি দিয়ে গেয়ে উঠে—

তীর ছোটে শন্‌শন্—বাতাসের আগে,
চোখ ঘোরে বনবন—উল্‌কার বেগে।
তীর খেয়ে শুয়োরেরা মরে ছারখার—
পাবেই খুড়োগো তুমি শিরোপা এবার।

গান শুনে আরো চটে উঠে গিরগিন্। বলে—'বেশ বেশ ছোক্‌রা, দেখা যাবে কার কত কেরামতি।'

এমনি করে মুখে মুখে যুদ্ধ করতে করতে গিরগিন্ আর বাইজান এসে পৌঁছাল পারস্যের উত্তরে, আমন দেশে। শহরটার গায়ে

জংগলের ধারে এসে তুজনে ঘোড়া থেকে নামল।
গিরগিন্ বলল—'দেখ ছোকরা এখন থেকে আমরা আলাদা আলাদা চলব। দিনভোর বুনো-শুয়োর শিকার কোরে সন্ধ্যেবেলায় এখানে এসে হাজির হবো। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলায় হিসেব নিকেশ হয়ে যাবে কে কটা শুয়োর মেরেছে। ব্যস্, এমনি করে চলবে যতদিন না সব শুয়োর শেষ হচ্ছে। কি, এতে আপত্তি আছে নাকি ?'
'কি বল খুড়ো, এতো সোজা ব্যবস্থা। রাজি, পুরোপুরি রাজি।'
বাইজান আর গিরগিন্ জংগলে জংগলে দিনভোর ঘুরে বেড়ায় আর বুনো শুয়োর মারে। কিন্তু ছোকরা বাইজান যেমন চালাক তেমনি চটপটে। ধনুকের হাতও তেমনি নিখুঁত। ফলে প্রতিদিন সন্ধেবেলায় হিসেবে দেখা গেল বাইজানের হাতেই বুনো-শুয়োর মরছে বেশী।
এমনি করে পনেরো দিনের শেষে দেখা গেল আমনের জংগল থেকে বুনো শুয়োরের দল বিলকুল সাফ হয়ে গেছে। তখন হিসেবে দেখা গেল বুড়ো গিরগিন্ মেরেছে এক হাজার চারশ শুয়োর আর ছোকরা বাইজান মেরেছে তুহাজার তিনশো শুয়োর।
বাইজান হেসে গিরগিন্‌কে বলল—'খুড়ো আমিতো জিতে গেছি। তাহলে আমিই পয়লা নম্বর তীরন্দাজ, কি বল ?'
দেঁতো হাসি হেসে গিরগিন্ বলল—'জিতেছ যখন, তখন তুমিই পয়লা নম্বর।' মনে মনে কিন্তু চিন্তা কোরে চলেছে গিরগিন—'না, ছোকরা বাইজানের কাছে হেরে গেলেও এর শোধটা নিতেই হবে। তা না হোলে সুলতানের কাছে গিয়ে মুখ দেখাবো কি কোরে।
চিন্তা করতে এক তুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল গিরগিনের মাথায়। মনে মনে বলল—বাছাধন এবার টেরটি পাবে গিরগিনের সংগে লড়াই করার। গিরগিন কাউকে ছেড়ে কথা বলে না।
ততক্ষণে তুষ্টু মতলব পুরোপুরি ঠিক করে ফেলেছে গিরগিন। তাই নিজের রাগকে মন থেকে মুছে ফেলল। মুখে মিষ্টি হাসি আনল।

তারপর সিধেসাধা ছোকরা বাইজানকে বলল—'বাপুহে, এতদিন খুব ধকল গেল আমাদের কি বল? তাছাড়া তুমি তো সিংহের বিক্রমে ছুটোছুটি করে আমার প্রায় দ্বিগুণ শুয়োর মারলে। তা দেশে ফেরার আগে দুএকটা সুন্দর জায়গা দেখবে না?
'সুন্দর জায়গা থাকলে কেউ না দেখে ফেরে নাকি? তা খুড়ো জায়গাটা কদ্দুর?'
'কতদূর আর? মাত্র দুদিনের পথ। তুরাণ রাজ্যের সীমান্তে ভারী সুন্দর এক জায়গা আছে। পাহাড়ের গা-বেয়ে নেমে এসেছে ঝিরঝিরে নদী। নদীর জল হীরের মত টলটলে সবুজ। সবুজ লম্বা সাইপ্রাস গাছ। বড় ভালো সে জায়গা।'
জায়গাটার কথা শুনেই ছোকরা বাইজান চন্‌মন্ করে উঠল। বলল—'বাঃ, এমন সুন্দর জায়গা না দেখে ফেরা মানে মূর্খামী।'
বুড়ো গিরগিন তখন বলল—'কিন্তু বাপু, একটা ঝামেলা এর মধ্যে আছে। জায়গাটা কিন্তু তুরাণের শাহ আফ্রিসায়েরের। জানইতো তুরাণরাজ্যের সংগে আমাদের পারস্যের সুলতান কৈখসরুর বহুদিনের ঝগড়া চলে আসছে। তাই ভাবছি তুরাণের শাহ আফ্রিসায়েরের রাজ্যে যাওয়া কি ঠিক হবে?'
কথা শুনে এবার রুখে দাঁড়িয়েছে বাইজান।—'আরে, আমরা কি তুরাণ রাজার দেশ জয় করতে যাচ্ছি?' আমরা স্রেফ সুন্দর জায়গাটা দেখতে যাচ্ছি। এর মধ্যে লড়াই আসছে কোথা থেকে?'
—'না, না, এর মধ্যে যে আরও ব্যাপার আছে বাইজান। তুরাণের সবাই জানে তুরাণের অপরূপা-সুন্দরী রাজকন্যা মানিজে সমস্ত বসন্তকালটা এই সুন্দর বাগনটায় এসে থাকে। তাই এই সময়ে ঐ সুন্দর বাগানটার চারপাশে অন্য কোনও লোকের যাবার উপায়ই নেই। তাই আমরা এ সময়ে ঐ বাগানটায় যেতেই পারি না।'
'দেখো খুড়ো, এই বাইজানের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। তুমি বলছ বাগানটা খুব সুন্দর। তুমি বলছ রাজকন্যা মানিজে ভারী

সুন্দর দেখতে। এই দুই সুন্দর জিনিষ দেখার জন্য আমি সব ঝক্কি মাথায় নিতে রাজী। কাল সকালেই আমরা তুরাণের শাহ আফ্রিসায়ারের বাগানের দিকে রওনা হচ্ছি। বাগানও দেখব রাজকুমারীকেও দেখব এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

বুড়ো গিরগিন্ মনে মনে খুব খুশী। তার মতলবমত কাজ হচ্ছে এবার। মনে মনে বলল—যাওনা একবার ঐ বাগানে, জ্যান্ত আর ফিরতে দেবে না অফ্রিসায়ার।

বুড়ো গিরগিন্ আর ছোকরা বাইজানতো রওনা হোল তুরাণ শাহ আফ্রিসায়ারের বাগানের দিকে। পারস্যের সীমানার শেষে যখন তারা এসে পৌছাল তখন গিরগিন্ বলল—'দেখ বাইজান, পারস্যের সীমানা পার হয়ে তুরাণ রাজ্যে ঢুকতে আমার সাহস হচ্ছে না। আমিতো আর তোমার মত তেজী জোয়ান নই যে দরকারে জোর লড়াই করতে পারব। তুমি পারস্যের সেরা তীরন্দাজ, দরকার হোলে তুমি লড়াই করে পালিয়ে আসতে পারবে।'

'বাঃ, তাহলে আমি কি আফ্রিসায়েরের বাগান দেখে একলাই পারস্যে ফিরব? সুলতান আমাদের দুজনের উপর তাহলে যে রেগে যাবে।'

বাইজানের কথা শুনে গিরগিন্ বলল—'দ্যুৎ বোকাছেলে, আমি কি এখান থেকে একা দেশে ফিরছি নাকি? এখানে, এই সীমানার ধারে তাবু খাটিয়ে তোর জন্য অপেক্ষা করব। তুই যাবি, বাগান দেখবি চটপট ফিরে আসবি। তারপর দুজনে দেশে ফিরব।'

কথাশুনে খুশীমনে বাইজান ঘোড়ার লাগাম ধরে টান মারল। ঘোড়া পারস্যের সীমানা পার হয়ে তুরাণ রাজ্যে ঢুকে পড়ল।

বুড়ো গিরগিন্ এবার চেঁচিয়ে বলল—'বাইজান, একটা কথা মনে রাখিস্, বাগান দেখেই ফিরে আসিস্। আফ্রিসায়ারের মেয়ে, দুধে আলতা রঙের পরীর মত সুন্দরী রাজকন্যা মানিজেকে দেখবার জন্য যেন থেকে যাস্ না। তাহলেই কিন্তু ঘোর বিপদ হবে।'

বুড়ো গিরগিন্ কিন্তু ইচ্ছে করেই একথাগুলো বলল। সেতো জানে,
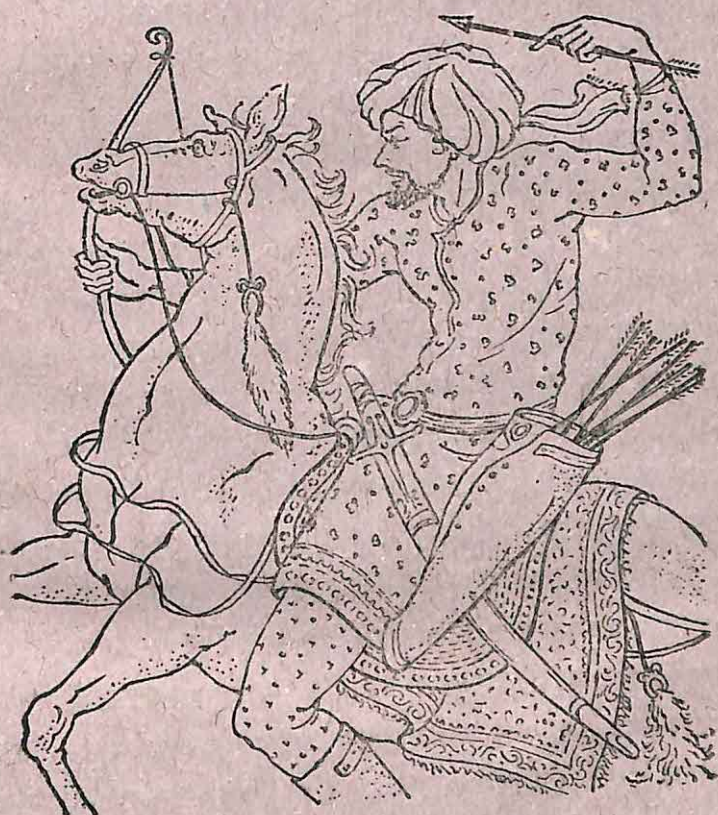
বাইজান ঘোড়ার লাগাম ধরে টান মারল।

যা করতে বাধা দেওয়া হবে জেদী ছোকরা বাইজান ঠিক সেটাই করবে। ভয়ডর বলে তার শরীরে কিচ্ছু নেই। কারণ সে জানে বাতাসের আগে তার তীর ছোটে। তাছাড়া পারস্যের বীর সেনাপতি রুস্তমের বড় পেয়ারের সাকরেদ সে। তাই যেকোন অসম্ভব কাজে ভয় পায় না বাইজান।

হলও তাই। বুড়ো গিরগিনের শেষের কথাগুলো শুনেই ছোকরা বাইজান ঠিক করে ফেলল আফ্রিসায়ারের বাগানটা দেখলেই হবে না। তুরাণের রাজকন্যা মানিজেকেও দেখতে হবে।

বাইজান এসে পৌছাল পাহাড়ের নীচে, সুন্দর বাগানটার কাছে। ঝর্ণা নেমে এসেছে পাহাড় থেকে নীচে, বাগানের মাঝখান দিয়ে ঝির্ঝির্ করে বয়ে চলেছে। আখরোটের গাছ ঘিরে আছে বাগানটাকে। কি অদ্ভুত সুন্দর বাগানটা।

বাইজান কিন্তু চারদিকে তাকাচ্ছে, কোথায় দেখা পাবে রাজকন্যা মানিজের। বাগানের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখতে পেল সাদা তাঁবুর সারি। আর সেই তাঁবুগুলোর ঠিক মাঝখানে সোনার কাজ করা একটা তাঁবু ঝকমক করছে। চালাক ছোকরা বাইজান চট করে বুঝে ফেলল সোনালী তাঁবুতেই থাকে রাজকন্যা মানিজে।

বাইজান আস্তে আস্তে ঘোড়া চড়ে এগুতে লাগল রাজকন্যার তাঁবুর দিকে। হঠাৎ কোথা থেকে দুজন ঘোড়সোয়ার রক্ষী দুপাশ থেকে এসে পথ আটকে দাঁড়াল বাইজানের। রক্ষীরা বলল—'কে তুমি? রাজকন্যার এই সংরক্ষিত বাগানটায় ঢুকলে কোন্ সাহসে?'

বাইজান বলল—'দেখ বাপু, তোমরা আমার রাস্তা আটকে ঝামেলা সুরু কোরো না। আমার যা বলার আমি শুধু রজকন্যাকেই বলব।'

বাইজানের কথা শুনে রক্ষীরা চিন্তা করল কি করা যায়। তারা ভাবল বিদেশী লোকটা তাদের দেখে ভয় পেয়ে পালাল না, আবার বলছে শুধু রাজকন্যার সংগেই কথা বলবে। তার মানে লোকটা নিশ্চয়ই কারুর দূত-টুত হবে।

এই ভেবে একজন রক্ষী রাজকন্যা মানিজের প্রধান সহচরীর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বলল। প্রধান সহচরী রাজকন্যাকে সংগে সংগে ঘটনাটা জানাল।

রাজকন্যা একটু চিন্তা কোরে বলল—'ঠিক আছে, নিয়ে এসো বিদেশী লোকটাকে।

বাইজানকে নিয়ে রক্ষীরা প্রধান সহরচীর কাছে পৌঁছে দিল। সহচরী নিয়ে এল রাজকন্যা মানিজের কাছে।

রাজকন্যা বাইজানকে দেখে অবাক হোয়ে তাকিয়ে থাকে। বেতের মত সটান চেহারা, আপেলের মত টুকটুকে রঙ। আবার চেহারাটাও সতেজ-বলশালী।

ওদিকে রাজকন্যাকে দেখে বাইজানেরও চোখে পলক পড়ে না। দুধে-আলতা গায়ের রঙ। সাইপ্রাস গাছের মত ছিপছিপে গড়ন। টুকটুকে রাঙা ঠোঁট। মেঘের মত একরাশ চুল।

রাজকন্যা মানিজে বললে—'কে তুমি?'

বাইজান বলল—'আমি বাইজান। পারস্যের সুলতান কৈ-খসরুর সেনাদলে কাজ করি। আমি তুরাণের সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখতে এতদূরে ছুটে এসেছি।'

রাজকন্যার মুখে সুন্দর হাসি খেলে যায়। বলে—'বাইজান, এবার তো রাজকন্যা দর্শন হল। এবার কি করবে? পারস্যে ফিরে যাবে?'

বাইজান বলল—'না, সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখার পর শুধু শুধু ফিরে যাব না। রাজকন্যাকে নিয়েই ফিরব। তাতে যদি আমার জীবন যায় তো যাক্। বাইজান ভয়ডর বলে কিচ্ছু জানে না।'

সুপুরুষ বাইজানকে দেখে রাজকন্যার কিন্তু এদিকে ভাল লেগে গেছে। তাছাড়া ওর সাহস দেখেও রাজকন্যা মুগ্ধ। রাজকন্যা বলল—'বাইজান, তুমি দেখছি বেশ, সাহসী। তুমি যদি চাও আমি যে কয়দিন এই বাগানে আছি, সে কয়দিন থাকতে পার।'

এরপর তুরাণের রাজকন্যা মানিজে আর পারস্যের সেনাদলের

নওজোয়ান বাইজান বেশ সুখে-আনন্দে ঐ বাগানে থেকে গেল। এমনি করে একটা মাস পার হল। রাজকন্যা মানিজের রাজপ্রাসাদে ফেরার সময় এসে গেল। রাককন্যা মানিজে আর তীরন্দাজ বাইজানের ভীষণ মন খারাপ। কেননা দুজনকে তো এবার দুদিকে ফিরে যেতে হবে। একজন যাবে তুরাণের রাজপ্রাসাদে, অন্যজন পারস্যের সেনাদলে।

শেষকালে দুজনে মিলে ঠিক করল—না, এখানেই তারা আগে বিয়েটা সেরে ফেলবে। তারপর রাজপ্রাসাদে ফেরার পর চেষ্টা করে দেখবে সুলতান আর শাহ যাতে এই বিয়েতে মত দেন।

বনের মধ্যে রাজকন্যা মানিজে আর তীরন্দাজ বাইজানের বিয়েও হয়ে গেল। এইবার বাইজান বলল—'মানিজে, এবার পারস্যে ফিরতে হবে তা নাহলে সুলতান কৈ-খসরু ভীষণ রেগে যাবেন।'

রাজকন্যার কিন্তু বাইজানকে ছেড়ে দিতে একটুও মন চাইছে না। মানিজে তখন তার প্রধান সহচরীর সংগে গোপনে মন্ত্রণা করল। তারপর মন্ত্রণামত রাজকন্যা মানিজে বাইজানকে বলল—'বাইজান, আজকের রাতটায় শেষবারের মত আমরা না হয় একসংগে খাবার দাবার খাই, বিশ্রাম করি। কাল সকালে না হয় তুমি পারস্যের দিকে রওনা হবে।'

বাইজানেরও তো মনটা খুব ভাল লাগছিল না মানিজেকে ছেড়ে যেতে। তাই মানিজার এই প্রস্তাবে রাজী হোয়ে গেল।

সে রাতে বনের মধ্যে রাজকন্যার সোনালী তাঁবুতে জোর খাওয়া-দাওয়া হোল। খাওয়া দাওয়া শেষে রাজকন্যা নিজের হাতে বাইজান-কে পানীয় দিয়ে বলল—'বাইজান, বিদায়ের আগে এই আমাদের শেষ পানীয়।'

বাইজান সেই সুন্দর ঠাণ্ডা শরবৎ খেয়ে ফেলল। ব্যাস্, তারপরই অজ্ঞান। হবেই বা না কেন? রাজকন্যা তার সখীর সংগে পরামর্শ করে ঐ পানীয়তে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। তাই

পানীয় খেতেই বাইজান অজ্ঞান।
বাইজান অজ্ঞান হোতেই মানিজের সখীরা ওকে নিয়ে সে রাতেই রওনা হোল তুরাণের রাজপ্রাসাদের দিকে।
রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছাতেই মানিজের সখীরা বাইজানকে রাজকন্যা মানিজের প্রাসাদে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বাইজানের জ্ঞান ফিরতেই সে অবাক্। এ কোথায় এল সে! এতো পারস্যের সেনাদলের ছাউনী নয়।
এই সময় মানিজে এসে সব কিছু বলল।—সব কথা শুনে বাইজান বলল—'মানিজে, তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমারও মন চাইছিল না। কিন্তু আমাকে এখানে এনে যে বিপদ সৃষ্টি হোল। আফ্রিসায়ারের কানে এই খবর গেলে কি আমাদের ভাল হবে?'
মানিজে বলল—'না, কোন চিন্তা কোর না বাইজান, বাবা আমাকে খুব ভালবাসে। হোক্ না পারস্যের সুলতানের সংগে তার শত্রুতা, তা বলে আমি যা চাইব বাবা তাই-ই দেবে।'
এদিকে তুরাণের শাহ আফ্রিসায়ারের কানে খবর চলে গেছে যে তার মেয়ের সংগে এক অপরিচিত যুবক এসেছে রাজকন্যার প্রাসাদে। শাহ আফ্রিসায়ার খবর শুনে ভীষণ রেগে গেলেন।
আফ্রিসায়ার রেগেমেগে এসে হাজির হোলেন মেয়ের প্রাসাদে। এসে বললেন—'মানিজে, তোর সংগে কোনও বিদেশী যুবক এসেছে?'
মানিজে বলল—'হ্যাঁ বাবা এইযে ছেলেটি। এর নাম বাইজান। খুব ভাল তীরন্দাজ। আমি একে বিয়ে করেছি বাবা।'
'কি! তুই একে বিয়ে করেছিস্? আমার মতামত না নিয়ে তুই বিদেশী ছোকরাকে বিয়ে করলি? তা এ ছোকরা থাকে কোথায়?
মানিজে বলতে বাধ্য হল—'বাবা, এ হচ্ছে পারস্যের সুলতান কৈ-খসরুর সেরা তীরন্দাজ।'
'কি, পারস্যের সুলতানের লোক হচ্ছে এই ছোকরা? নিশ্চয়ই এ বেটা গুপ্তচর। হতভাগা কৈ-খসরু নিশ্চয়ই বদ-মতলবে তার লোককে

এই রাজ্যে পাঠিয়েছে। আফ্রিসায়ার হুকুম করলেন লটকাও এই বদ-ছোকরা বাইজানকে ফাঁসীতে। আমার চির-শত্রু কৈ-খসরুর লোককে বেঁচে থাকতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

রাজকন্যা মানিজা শাহের পায়ে পড়ে বলল—'বাবা, বাইজানকে মেরো না। বাইজানের সংগে যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।'

আফ্রিসায়ার তখন রাগে গরগর করছেন। বলছেন—'ওসব কোন কথা শুনছি না। ঐ ছোকরা বাইজানকে ফাঁসীতে ঝুলতেই হবে।'

বাইজান কিন্তু এসবে একটুও ঘাবড়ায় নি। শুধু যখন দেখল আফ্রিসায়ার তাকে ফাঁসীতে ঝুলাবেই তখন বলল'—লটকান ফাঁসীতে আমাকে। কিন্তু তারপর টের পাবেন মজা। আমি হচ্ছি পারস্যের বীর সেনাপতি রুস্তমের পেয়ারের তীরন্দাজ। আমার ফাঁসীর খবর রুস্তমের কানে গেলে তুরাণের এই রাজ্য আক্রমণ করে রুস্তম ছার-খার করে দেবে। রুস্তমের নামটা নিশ্চয়ই সবার জানা আছে?'

বাইজানের কথাটা সবার কানে গেল। মন্ত্রী সেনাপতি ফিস্‌ফিস্ করে আলোচনা করল। তারপর শাহ আফ্রিসায়ারকে বলল—হুজুর সেনাপতি রুস্তম বড় দুর্দ্ধর্ষ। ওকে চটালে ঐ রাজ্যের উপর যে হামলা হবে তাতে তুরাণ রাজ্যের বহু লোকজন মারা পরবে এটাতো ঠিক। তাই আমরা বলছিলাম, বাইজানকে না মেরে কোথাও না হয় বন্দী করে রাখুন।

তুরানের শাহ কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর বলেলন—'ঠিক আছে, তোমাদের কথাই মেনে নিলাম। ছোকরা বাইজানকে এই রাজ্যের শেষে, পাহাড়ের ধারে, গুহার মধ্যে বন্দী করে রাখো। গুহার মুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করে দাও। সূর্য্যের আলো যাতে সেই গুহায় ঢুকতে না পারে দেখো। তাহলে আপনা-থেকেই ছোকরা মারা পড়বে আলো হাওয়া বিহীন ওই গুহার মধ্যে।'

বাবার এই কঠিন আদেশ শুনে রাজকন্যা মানিজে খুব কান্নাকাটি শুরু করল। সভাসদরাও শাহকে বলল—বাইজানের জন্য মানিজের

ভীষণ কষ্ট হবে। মানিজে তো আপনার একমাত্র সন্তান। মানিজের কথা ভেবে বাইজানের শাস্তিটা কমিয়ে দিন।

আফ্রিসায়ার রেগে বললেন—'না না। বাইজান হচ্ছে আমার চিরশত্রু কৈ-খসরুর লোক। ওর কোন ক্ষমা নেই। মেয়ে মানিজের যদি বাইজানের জন্য এতই চিন্তা, তবে ওকেও তাড়িয়ে দাও। সমস্ত গয়নগাটি খুলে ওকেও নির্বাসন দিয়ে এসো পাহাড়ের নীচে, বাইজানের গুহার কাছে। দুজনে কেউ কাউকে দেখতে পাবেনা, অথচ খুব কাছাকাছি থাকবে। মানিজের চোখের সামনে বাইজান শেষ হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে মানিজের শাস্তি। আমার চিরশত্রুর লোককে বিয়ে করার মজাটা টের পাবে মানিজে।'

আফ্রিসায়ারের আদেশ। মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদরা আর কি করতে পারে। সেনাপতি তখন বাইজানকে লোহার শিকলে হাত-পা-বেঁধে নিয়ে চলল। সাতদিন সাতরাত চলার পর, তুরাণ-রাজ্যের সীমানায়, পাহাড়ের রাজ্যে এসে পৌছাল। তারপর এক নীচু গুহার মধ্যে বাইজানকে ঢুকিয়ে বড় বড় :পাথর দিয়ে গুহার মুখটা বন্ধ করে দিল।

সেনাপতি ফিরে এল রাজসভায়। এইবার মানিজেকে নিয়ে চলল সেনাপতি। মানিজের গায়ের সমস্ত গহণাপত্র খুলে, খুব সাধারণ বেশে তাকে নিয়ে যাওয়া হোল বাইজানের গুহার কাছে। মানিজেকে কিন্তু কোনও গুহায় বন্দী করা হোল না। শুধু জনমানবহীন সেই পাহাড়ের রাজ্যে মানিজেকে নির্বাসন দিয়ে চলে এল সেনাপতি।

বাইজান এদিকে যখন গুহার মধ্যে বন্দী তখন পারস্যের সেই বুড়ো তীরন্দাজ গিরগিন ফিরে এসেছে পারস্যের রাজদরবারে। সুলতান কৈ-খসরু বললেন—'কি ব্যপার, তুমি একলা ? বাইজান কই ?'

সুলতানের সামনে মাথা নীচু করে বদমাইস্ বুড়ো গিরগিন বলল—'হুজুর, লজ্জার কথা কি বলব। আমরা দুজনেতো আমন প্রদেশে পৌছালাম। তারপর বুনো শুয়োর মারার প্রতিযোগীতা চলল

দুজনের। ছোকরা আমার সংগে পারবে কেন? এই দেখুন না কত শুয়োর আমি মেরেছি। বাইজান যখন হেরে গেল বলল দূত্তোর, পারস্যের সুলতানের কাছে আর থাকবই না। এই বলে আপনার চিরশত্রু—শাহ আফ্রিসায়ারের রাজ্যে চলে গেল।'

বুড়ো বদমাইস গিরগিন সুলতানকে বুনো শুয়োরের মাথাগুলো দেখালো। এর মধ্যে বেশীর ভাগই বাইজানের মারা শুয়োর। কিন্তু সিধে ধরণের সুলতান বুড়ো গিরগিনের মতলব ধরবেন কি করে? তিনি ঘোষণা করলেন—আজ থেকে বুড়ো গিরগিন পারস্যের সেরা তীরন্দাজ বলে গণ্য হবে। আর বিশ্বাসঘাতক বাইজানকে যে ধরে আনতে পারবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।

যথাসময়ে সুলতানের এই ঘোষণা সেনাপতি বীর রুস্তমের কানে গেল। সুলতানের ঘোষণা শুনে রুস্তম তো অবাক। তার সেরা সাকরেদ বাইজান বুড়ো গিরগিনের কাছে হেরে গেল? হেরে গিয়ে সুলতানের শত্রু তুরাণের শাহের দলে যোগ দিল? না কথাগুলো খুব বিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু কথাগুলো যদি সত্যিই না হবে তবে বাইজান গেল কোথায়? চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ল রুস্তমের—তাইতো সুলতানের কাছেতো এক আশ্চর্য্য পেয়ালা আছে। সেই পেয়ালা হাতে নিয়ে সুলতান যাদুমন্ত্র আওড়ালে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে জানতে চাইলেই জানতে পারেন।

কথাটা মনে হোতেই রুস্তম সুলতানের কাছে এসে পৌছালো। রুস্তমকে দেখেই কৈ-খসরু বলে উঠলেন—'এই যে সেনাপতি, শুনেছ তোমার পেয়ারের সাকরেদের কথা। তীরের লড়াই-এ হেরে গিয়ে আমার শত্রু আফ্রিসায়ারের দলে গিয়ে ভিড়েছে। নাও, এবার ওকে যেভাবে হোক বন্দী কোরে নিয়ে এসো আমার সামনে। ওকে, শূলে না চড়ালে আমার রাগ যাবে না।'

'নিশ্চয়ই সুলতান, বেইমান আর বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি মৃত্যুই।

তারপর দুহাতে পেয়ালা ধরে যাদুমন্ত্র আওড়ালেন—

বাইজান যদি সত্যিই বেইমান আর বিশ্বাসঘাতক হয় আমিই নিজে ওকে শূলে চড়াব। আর সেজন্য সুলতান আপনার সাহায্য দরকার।'
'আমার সাহায্য! তোমার মত বীর সেনাপতিকে আমি কি সাহায্য করব?'—সুলতান কৈ-খসরু অবাক হোয়ে জিজ্ঞেস করেন।
'হ্যাঁ সুলতান, বাইজানকে ধরে নিয়ে আসতে হোলে ও এখন কোথায় আছে সেটা জানা চাইতো। আপনার কাছে এক যাদু-পেয়ালা আছে। যাদু-পেয়ালায় দেখুন না ও সত্যিই তুরাণের রাজদরবারে আছে কিনা?'
'কোথাটা মন্দ বলনি রুস্তম। একবার দেখেই নিই সত্যি ছোকরাটা কোথায় আছে।'—এই বলে সুলতান তার যাদুপেয়ালা নিয়ে এলেন। তারপর দুহাতে পেয়ালা ধরে যাদুমন্ত্র আওড়ালেন—

"অন্তর-মন্তর-যন্তর, যাদুপেয়ালা মন্তর।
ঝু-ঝু-ঝু, নিকা—লো যাদু।
আসমান দুনিয়া ঢুড়ো, বাইজান কো নিকালো।
অন্তর-মন্তর-যন্তর, লাগে যাদুপেয়ালা মন্তর।"

সুলতানের যাদুমন্তর শেষ হতেই যাদু পেয়ালায় ধীরে ধীরে এক ছবি ভেসে উঠল। দেখা গেল তুরাণের সীমান্তের পাহাড়ের রাজ্য। তারপর সেই ছবি মিলিয়ে গেল। এবার ভেসে উঠল পাহাড়ের মাঝে একটা গুহার সামনে সুন্দরী একটা মেয়ে কাঁদছে। আবার সে সে দৃশ্য মিলিয়ে গেল। এবার দেখা গেল অন্ধকার গুহার মাঝখানে অসহায় অবস্থায় বন্দী বাইজান।
বাইজানকে এই অবস্থায় দেখে সেনাপতি রুস্তম বলে উঠল—'সুলতান, এই দেখুন ছোকরা তীরন্দাজ বন্দী। তার মানে আপনার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। করলে কি তুরাণের শাহ ওকে বন্দী করত? তাহলে মিথ্যে কথা বলেছে বুড়ো তীরন্দাজ গিরগিন। আপনি গিরগিনকে বন্দী করার আদেশ দিন। আমি বরং যাচ্ছি বাইজানকে উদ্ধার করে আনতে। বাইজান উদ্ধার হোলে তবে

আসল খবর জানা যাবে।'

সুলতান কৈ-খসরুর আদেশে বুড়ো গিরগিনকে বন্দী কোরে কারাগারে রাখা হোল। সুলতান সেনাপতি রুস্তমকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে গিয়ে বাইজানকে উদ্ধার করার আদেশ দিলেন।

রুস্তম বলল--'না সুলতান, আমার সৈন্যসামন্ত চাই না। আমি শুধু জনাদশেক সৈন্য নেব। আর নেব দামী দামী কাপড় জামা, হীরে মোতি, বিক্রী করার জন্য। আর সাধারণ কিছু লোকজন।'

কৈ-খসরু বললেন—'রুস্তম তোমার মতলবটা কি বলত? লড়াই না করে বাইজানকে উদ্ধার করবে কি করে?'

রুস্তম বলল—'সুলতান, লড়াই করে হয়ত জিততে পারি—কিন্তু তার আগে ওরা তো বাইজানকে মেরেও ফেলতে পারে। তাছাড়া ঠিক কোন গুহায় বাইজান বন্দী সেটাও বার করা খুব সহজ হবে না। আমি ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ওখানে যাব। যাদুপেয়ালায় দেখেছি সুন্দরী একটি মেয়ে গুহার কাছে কাঁদছে। ঐ মেয়ের সাহায্যেই বাইজানকে উদ্ধার করা যাবে। তাই মিছিমিছি লড়াই কোরে লোকজনকে মারব কেন।'

সুলতান এ কথায় খুশীই হলেন। বললেন—'ভালই বুদ্ধি করেছ সেনাপতি। ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে যাওয়াই ভাল হচ্ছে। যাও, হীরে মোতী, কাপড়-জামা, ঘোড়া-উঠ যা চাও নিয়ে যাও। মোটকথা, বাইজানকে উদ্ধার করা চাই। তা না হলে পারস্যের মর্যাদা আর থাকবে না।

রুস্তম বলল—'নিশ্চিন্ত থাকুন সুলতান। রুস্তম পারস্যের সম্মান ফিরিয়ে আনবে।'

এরপর লোকলস্কর-জিনিসপত্তর নিয়ে রুস্তম রওনা হোল তুরাণের সীমানার দিকে। তারপর এসে পৌঁছাল পাহাড় রাজ্যের প্রান্তে। ঐখানে তাঁবু খাটিয়ে সওদাগুলো সাজিয়ে ফেললো।

ক্রমে খবর পৌঁছে গেল তুরাণের সব জায়গায় যে বিদেশী বণিক

এসে পৌঁছেছে সস্তা দামের সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে। ক্রেতারা একে একে আসতে লাগল কেনাকাটির জন্য।

এ খবর এদিকে এসে পৌঁছেছে গুহার বাইরে বেচারা মানিজের কাছেও। মানিজে ভাবল যাই বণিকের কাছে। যদি ওর মারফৎ কোনও খবর পারস্যের সুলতানের কাছে পাঠান যায়।

মানিজে এস পৌঁছাল ছদ্মবেশী রুস্তমের কাছে। জিজ্ঞেস করল—'হ্যাগো বণিক, তুমি এখন কোথা থেকে আসছ?'

ছদ্মবেশী রুস্তম বলল—'এই তো পারস্যের রাজদরবারে সওদা কেনা-বেচা করে আসছি। কেন কি জিনিস চাই তোমার?'

'আচ্ছা বণিক, তুমি ওখানে বীর রুস্তমের নাম শুনেছ? জান, ওর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য এখানেই এক গুহায় বন্দী। ওকে দু-একদিনের মধ্যে উদ্ধার না করলে ও বেচারা মারাই পড়বে।'

ছদ্মবেশী রুস্তম ভালকরে তাকিয়ে দেখল যাদুপেয়ালায় যে মেয়ে-টাকে গুহার সামনে কাঁদতে দেখেছিল এই মেয়েটা ঠিক সেরকমই দেখতে। রুস্তম বুঝতে পারল সে ঠিক জায়গায় এসেছে।

তবুও পরীক্ষা করার জন্য বলল—'দেখ বাপু আমি ব্যবসা করি। বীর-টিরের সংগে আমার কি সম্পর্ক? তবে তোমার কথা শুনে আমার দুঃখই হচ্ছে। তা ঐ বন্দীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?'

রাজকন্যা তার সব কথা বলল। এও বলল—বাইজান যদি মারা যায় তবে সেও আত্মহত্যা করবে।

ছদ্মবেশী রুস্তম বলল—'না, না খবরদার, আত্মহত্যা করা পাপ, সে কাজ কোর না। আমি বরং তোমাকে যাদু আরকে তৈরী মুরগীর রোস্ট দিচ্ছি। তুমি কোনওভাবে ঐ রোস্ট বন্দীকে যদি খাওয়াতে পার তবে সে বেঁচে থাকবে। আমি এটুকুই সাহায্য করতে পারি।'

বেচারা রাজকন্যা মানিজে। এ প্রস্তাবে সে রাজী হল। মনে মনে ভাবল, রোস্ট খেলে যদি বাইজান বেঁচে থাকে তবে সেটাও মন্দ কি।

এদিকে ছদ্মবেশী রুস্তম মুরগীর রোস্টের পেটের মধ্যে তার হাতের

আংটি ভরে দিল। মানিজে রোস্ট নিয়ে গুহার সামনে এল। চারদিক বন্ধ কিন্তু মানিজে তাতে দমে না গিয়ে বহু চেষ্টা কোরে একটা ছোট্ট গর্ত বার করল। তার ভিতর দিয়ে রোস্ট ভিতরে পাঠিয়ে দিল। রোস্ট ভিতরে পড়তেই চমকে উঠল বাইজান। উপরে ছোট্ট গর্তের দিকে তাকাতেই নজর পড়ল মানিজেকে।

কয়েকদিন কিচ্ছু খায়নি বাইজান। তাই রোস্ট পেয়ে দ্রুত হাতে রোস্ট খেতে আরম্ভ করল। খেতে খেতে হঠাৎ রোস্টের মধ্য থেকে আংটিটা হাতে এসে পড়ল। বাইজান একটু ভালোকরে তাকাতেই চমকে উঠল। আরে, এ যে বীর রুস্তমের হাতের আংটি!

বাইজান চেঁচিয়ে উঠল—'মানিজে,বীর রুস্তম এসেছে আমাকে উদ্ধার করতে। তোমাকে এই রোস্ট যে দিয়েছে সেই বীর রুস্তম।'

'সেই বীর রুস্তম!'—চমকে উঠে মানিজে। তার মানে বণিকই ছদ্মবেশী রুস্তম। মানিজে অপেক্ষা না কোরে দ্রুত ফিরে আসে ছদ্মবেশী রুস্তমের কাছে। মানিজেকে দেখে হাসে রুস্তম। বলে —'কি ব্যাপার মেয়ে, ফিরে এলে যে?'

'আপনিইতো বীর রুস্তম। বাইজানের গুরু। বাইজান আপনার আংটি দেখে একথা বলল। তাই আমি এসেছি আবার, আপনি বাইজানকে উদ্ধার করুন।'

'কিছু ভেবো না মেয়ে, আজ রাতেই বাইজান উদ্ধার পাবে। মনে রেখো আজ অমাবস্যা। যখন রাত গভীর হবে, চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে, তুমি বাইজানের গুহার সামনে মশাল জ্বালিয়ে বসে থেকো। তারপর যা করবার আমি করব। তুমি এখন ফিরে গিয়ে বাইজানকে এ খবরটা দিও।'

তারপর রাত হোল। চারদিক অন্ধকার। কথামত মানিজে মশাল জ্বেলে বসে আছে বাইজানের গুহার সামনে। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর শুনতে পেল অনেকগুলো ঘোড়ার শব্দ। তারপর এসে পৌঁছাল রুস্তম। পেছনে দশটা ঘোড়ায় দশজন বীর সৈনিক।

সৈনিকরা গুহার সামনের পাথরটাকে মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধল কয়েকটা জায়গায়। তারপর দশজন ঘোড়সোওয়ার সৈনিক সেই দড়িকে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। দশঘোড়ার টানে আস্তে আস্তে গুহার মুখের পাথর সরে গেল। বাইজান দ্রুত বাইরে চলে এল।

বাইজানকে বাইরে আসতে দেখে রুস্তম আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরল। সেই রাতেই, অন্ধকারে, রুস্তম আর তার দলবল বাইজান আর মানিজেকে নিয়ে রওনা হোল পারস্যের পথে।

সাতদিনের পথ চারদিনে অতিক্রম কোরে কৈ-খসরুর দরবারে ফিরে এল রুস্তম, বাইজান আর তুরাণের রাজকন্যা মানিজে।

বাইজানের মুখ থেকে সব শুনলেন সুলতান। বুড়ো গিরগিনকে কারাগার থেকে নিয়ে আসা হোল। গিরগিন স্বীকার করল বাইজান যা বলেছে সব সত্যি। তার আগের সব কথা মিথ্যে।

সুলতান বাইজানকে এবার শুধু সেরা তীরন্দাজ আখ্যাই দিলেন না, বরং রাজ্যের সহ সেনাপতি করে দিলেন। তারপর ধূমধাম কোরে বাইজান আর মানিজের বিয়ে দিলেন সুলতান কৈ-খসরু।